দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৭১ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮।। ৮ পৌষ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com



সাজঘরে সাজবদল

'নেত্রী' এখন দুর্গানাম জপিতেছেন

— পৃঃ ১৩

কার কত আসন	২০১৩	২০১৮
মধ্যপ্রদেশ (২৩০)		
বি জে পি	১৬৫	১০৯
কংগ্রেস	৫৮	১১৪
বি এস পি	৪	২
অন্যান্য	৩	৫
রাজস্থান (১৯৯)		
বি জে পি	১৬৩	৭৩
কংগ্রেস	২১	৯৯
বি এস পি	৩	৬
অন্যান্য	১৩	২১
ছত্তিশগড় (৯০)		
বি জে পি	৪৯	১৫
কংগ্রেস	৩৯	৬৮
বি এস পি	১	২
অন্যান্য	১	৫
মিজোরাম (৪০)		
বি জে পি	—	১
কংগ্রেস	৩৪	৫
এম এন এফ	৫	২৬
অন্যান্য	১	৮
তেলেঙ্গানা (১১৯)		
বি জে পি		১
কংগ্রেস		১৯
টি আর এস		৮৮
টি ডি পি		২

হার থেকে কি শিক্ষা নেবে বিজেপি?



আত্মসন্তুষ্টিতে না ভুগে দলকে আত্মসমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য তৈরি করতে হবে।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ৮ পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৪ ডিসেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

তর্কশীল ভারতবাসী, তর্কপ্রিয় বাঙ্গালি ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদির নটে গাছটি মুড়লো ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

বালুচিস্তানে বিক্ষোভের আড়ালে ▯ ড. সতীশ কুমার ▯ ৮

কোচবিহারে বিজেপির সভার জেরে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৃণমূল কংগ্রেসে ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১১

সাজঘরে সাজবদল - 'নেত্রী' এখন দুর্গানাম জপিতেছেন ▯ সুজাত রায় ▯ ১৩

দেশকে উন্নত করার প্রথম শর্ত হলো শক্তিশালী স্থায়ী সরকার ▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ১৫

তিন রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গড়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপদ আরও বাড়ল ▯ অমিতাভ মিত্র ▯ ১৯

ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হবে বিজেপি ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২১

তিন রাজ্যের ফলাফল বিজেপির সামনে আত্মসমালোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৩

ঊনিশে বিজেপি ফিরবে আরও বেশি শক্তি নিয়ে ▯ সনাতন রায় ▯ ২৫

বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি সামগ্রী আজও আকর্ষণ হারায়নি ▯ চূড়ামণি হাটি ▯ ৩১

সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের মা চণ্ডী ▯ শুভদীপ রায়চৌধুরী ▯ ৩৩

কী লজ্জা! খুনির নামে শহর ▯ নিশান্ত কুমার আজাদ ▯ ৩৫

হিন্দুরাষ্ট্র নেপালে গণতন্ত্রের নামে অবাধে ধর্মান্তরকরণ চলছে ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৭-১৮ ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০** ▯

নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **অঙ্গনা : ৪১**▯

অন্যরকম : ৪২ ▯ **সুস্বাস্থ্য : ৪৯** ▯

সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

কংগ্রেসের ধাপ্পা

দ্বিতীয় এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাহুল গান্ধী তাঁর বিখ্যাত ধাপ্পা-সিরিজ শুরু করেছিলেন লাল ডায়েরি দিয়ে। সময়ের দাবি মেনে ডায়েরির লাল রং ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু রাহুল নিজেকে বদলাননি। বস্তুত নিজের এবং তাঁর শতাব্দীপ্রাচীন দলটির ধাপ্পার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব— সকলেই দেশকে ধাপ্পা দিয়েছেন। রাহুল গান্ধী সেই পরম্পরারই ধারক ও বাহক। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে তাঁর মিথ্যে অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে। তিনি এখন আদালতে সরকারের দাখিল করা এফিডেবিটে ব্যাকরণগত ভুল নিয়ে আসর মাতাচ্ছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— কংগ্রেসের ধাপ্পা। দলটির ধাপ্পার ইতিহাসের পর্যালোচনা করবেন শৌভিক রাতুল বসু এবং চন্দ্রভানু ঘোষাল।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার



স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দিল্লি এখনও দূর অস্ত্

সদ্য অনুষ্ঠিত পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে বিজেপি তাহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের কাছে পরাভূত হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের মতো এই তিনটি রাজ্যে বিজেপিকে নির্বাচনী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ক্ষমতা দখল করিবার পর কংগ্রেসের রাজনৈতিক মনোবল কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস সাফল্যের মুখ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস তৎসহ বিরোধী দলগুলি উল্লসিত হইয়া প্রচার করিতে শুরু করিয়াছে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিদায় আসন্ন। তাহাদের প্রচার শুনিয়া ভ্রম হইতেছে যে, এই তিনটি রাজ্যেই বোধকরি বিজেপি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। কিন্তু সত্যটি তো তাহা নহে। নির্বাচনে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর ভিতর প্রাপ্ত ভোটের হিসাব তো তাহা বলিতেছে না। ছত্তিশগড়ে যদিও বা পনেরো বৎসর একাদিক্রমে ক্ষমতায় থাকিবার পর এইবার কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমরে বিজেপি যথেষ্টই খারাপ ফল করিয়াছে। কিন্তু রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে চিত্রটি কিন্তু তাহা নয়। মধ্যপ্রদেশেও একাদিক্রমে পনেরো বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছে বিজেপি। তৎসত্ত্বেও এই নির্বাচনে কংগ্রেসের সহিত তাহাদের ভোটের ফারাক মাত্র দশ হাজারের কিছু বেশি। রাজস্থানে এই ফারাক দেড় লক্ষেরও কম। এই দুই রাজ্যেই আশ্চর্যজনকভাবে নোটাতে ভোট পড়িয়াছে প্রভূত পরিমাণে। মধ্যপ্রদেশে নোটায় ভোট পড়িবার সংখ্যা ৪ লক্ষের কিছু বেশি। রাজস্থানে এই পরিমাণ ৫ লক্ষের কিছু বেশি। বুঝাই যাইতেছে, এই দুই রাজ্যেই কংগ্রেসের জয় আসিয়াছে কোনও ক্রমে। অতএব, যাঁহারা ভাবিতেছেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁহারা এখনই জিতিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা বড়ো দ্রুত সমাধানে পৌঁছাইতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের মনে রাখা দরকার—রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে বিজেপি নির্মূল হইয়া যায় নাই।

কংগ্রেসের এই বিজয়ে যাঁহারা কাড়া-নাকাড়া লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা খুব সুচতুরভাবে একটি তথ্যকে গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পাঁচটি রাজ্যের ভিতর তিনটি রাজ্যের উল্লেখ তাঁহারা করিতেছেন। কিন্তু অন্য দুই রাজ্য মিজোরাম বা তেলেঙ্গানার ফলাফল তাঁহারা কদাচ উল্লেখ করিতেছেন না। তেলেঙ্গানা এবং মিজোরাম এই দুই রাজ্যেই কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তেলেঙ্গানায় বিরোধী জোটের অন্যতম প্রবক্তা চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন তেলুগু দেশমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিয়া চন্দ্রশেখর রাওয়ের তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিল কংগ্রেস। তেলেঙ্গানার জনগণ তাহাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মিজোরামের পাঁচ দফায় মুখ্যমন্ত্রী থাকিবার পর লালথানহাওলা এবং তাহার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এইবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কাজই ২০১৯-এর পথ কংগ্রেসের খুব সুগম নহে।

তিন রাজ্যে নির্বাচনে জিতিবার পরই কংগ্রেস তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধীর নির্দেশে ১৯৮৪ সালে দিল্লিতে শিখ নিধন কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত কমলনাথকে মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসানো হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেসের ভিতরেই ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। জনমানসেও কংগ্রেসের প্রতি ধিক্কার পরিলক্ষিত হইতেছে। তিন রাজ্যে নির্বাচনে জিতিয়াই কংগ্রেস রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টা বিরোধী নেতা-নেত্রীরাও সুনজরে দেখিতেছেন না। কাজেই, জল বিস্তর ঘোলা হইবে বুঝাই যাইতেছে। বিরোধীরা যতই উল্লসিত হউন—দিল্লি এখনও তাহাদের নিকট দূর অস্ত্।

সুভাষিতম্

ন হি কশ্চিৎ বিজানাতি কিং কস্য শ্বো ভবিষ্যতি।
অথঃ শ্বঃ করণীয়ানি কুয়াদ্দ্যৈব বুদ্ধিমান্।।
আগামীকাল কী হবে কেউ জানে না। সেজন্য আগামীকালের কাজ যাঁরা আজই করেন তাঁরা বুদ্ধিমান।

তর্কশীল ভারতবাসী, তর্কপ্রিয় বাঙ্গালি

বিনয়ভূষণ দাশ

ভারতবাসী তর্কশীল, আর বাঙ্গালি স্বভাবতই তর্কপ্রিয়। ভারতের বৈশিষ্ট্যই হলো কোনও বিতর্কিত বিষয়ে তর্কসভা বসিয়ে আলোচনা আর বিতর্কের মাধ্যমে বিবাদিত বিষয়ের সমাধান করা। এই পরম্পরা ভারতে প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান। যাজ্ঞবল্ক-মৈত্রেয়ী-গার্গী, মণ্ডন মিশ্র এঁদের ঐতিহ্য ভারতীয়দের তর্কশীল করে তুলেছে। সহিষ্ণুতা দান করেছে। তবে সে সহিষ্ণুতা অন্যায়ের প্রতি নয়। সেখানে তাকে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' হবার কথাই বলা হয়েছে।

সম্প্রতি একটি বাজারি পত্রিকায় জনৈক আহমেদের 'অনুপ্রবেশকারী এবং উইপোকা' নামাঙ্কিত প্রবন্ধটি পড়ে বিষয়টি আবার চিন্তায় আঘাত করল। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে নানাজনের নানা মন্তব্য আমাদের চিন্তিত করে দেয়। কিন্তু একটা বিষয়, সেখানে সবাই নিজের মন্তব্য করতে পারে। কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সে সুযোগ নেই। কিন্তু তর্কশীল ভারতীয় তত্ত্ব মানতে হলে সে সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। আর সেটা না থাকলে শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোই হবে। একটা ন্যারেটিভ থাকলে তার বিপ্রতীপে অন্য ন্যারেটিভও থাকবে। উভয়কে পাশাপাশি স্থান দেওয়াই সুস্থ গণতন্ত্র। কোনও একটাকে দাবিয়ে রাখলে সুস্থ গণতন্ত্রের বিকাশ হতে পারে না।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সুস্থ গণতান্ত্রিক বিকাশে দ্বিচারিতাই প্রধান অন্তরায়। বুদ্ধিজীবী ও গণতন্ত্রপ্রেমী তাঁদের একতরফা মতামত দেবেন কিন্তু তার বিপ্রতীপে যে মত তার প্রকাশে সর্বতোভাবে বাধা সৃষ্টি করবেন এটা চালতে পারে না। এই বঙ্গে আজ পক্ষপাতপূর্ণ মতামতই প্রাধান্য পায়। বিরুদ্ধ মতের স্থান নেই।

সম্প্রতি অনুপ্রবেশকারী, শরণার্থী, উইপোকা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনায় বস্তুনিষ্ঠার স্থান নিচ্ছে এক পক্ষপাতমূলক আবেগ। অথচ, বিষয়টির আলোচনায় আরও বেশি আবেগহীন বস্তুনিষ্ঠা আশা করা যায়। ভারতের অনুপ্রবেশকারী আলোচনায় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটটি না বিশ্লেষণ করলে তা অসম্পূর্ণ এবং অর্ধসত্য হয়ে যায়।

শ্রী আহমেদের আলোচনায় বিশ্বের অনেক দেশের প্রসঙ্গ এসেছে কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির কোনও প্রসঙ্গই আসেনি। মানবের অবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে রোয়ান্দা, জার্মানি ইত্যাদি দূরের দেশের উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের দেশের মানবিক অবমূল্যায়ন প্রসঙ্গে। তাঁর আলোচনায় আমাদের নিকট প্রতিবেশী চীনের ইউঘুর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমারের প্রসঙ্গ কেন এল না বুঝলাম না। এটা কি ইচ্ছাকৃত?

মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়ন, উদ্বাসনে এই দেশগুলির চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনও দেশে আছে কি? অন্যান্য দেশের উদ্‌বাস্তু মানুষের সংখ্যা হাজারে হাজারে; আর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হওয়া মানুষের সংখ্যা লাখ লাখ ছাড়িয়ে কোটিও ছাড়িয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই উদ্বাসনের দ্বিতীয় কোনও উদাহরণ নেই। আজও আমাদের মধ্যে এমন লাখ লাখ মানুষ রয়েছেন যারা ওই উদ্বাসন ও অত্যাচারের শিকার। শ্রী আহমেদের কী এদিকে দৃষ্টি পড়ে না; তাই ওই দূরের পানে তাকানো! আমাদের একই ভাষার, একই ভৌগোলিক পরিবেষ্টণীর মানুষদের যেভাবে যে দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক অত্যাচার করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল সে আখ্যান কি আহমেদবাবু জানেন না?

এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উদ্বাস্তু' পুস্তকে সেই অবর্ণনীয় ঘটনার উল্লেখ করেছেন। দেশভাগের ঠিক পরে পরেরই এই ঘটনা। এক গ্রাম্য বধূ পুকুরে স্নান করছেন, হঠাৎই খেয়াল করলেন, পুকুরের চারপাশে যুবক, মাঝবয়সি অনেক মানুষ ভিড় করেছে। হঠাৎই পুকুরের একদিক থেকে আওয়াজ উঠল, 'পাক, পাক, পাকিস্তান।' অন্যদিক থেকে প্রত্যুত্তর হলো, 'হিন্দুর ভাতার মুসলমান'। এক প্রৌঢ় মুসলমান অন্য এক যুবককে বলল, 'ওরে তোর চাচিজানের পা অসাড় হয়ে গেছে, ওকে ধরে টেনে তুলে আন।' ওই গ্রাম্য বধূর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া হিন্দুদের 'মালউন' ও নানা নামে গাল দেওয়া তো আছেই। আমার এক মামাতো ভাই তার বাল্যকালের বিদ্যালয়ের বন্ধুদের তাকে 'মালউন' বলে খ্যাপানো আজও ভুলতে পারে না। শ্রী আহমেদ এবং অন্য বুদ্ধিজীবীরা এই অন্য 'ন্যারেটিভ'তাও খেয়ালে রাখুন। দূরের রোয়ান্দা, জার্মানি, দক্ষিণ আমেরিকার ঘর পোড়া দেখুন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং চীনের ইউঘুরদের বিষয়েও দিক্‌পাত করুন।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্থান থেকে ধর্মীয় এবং সংস্কৃতিগত কারণেই হিন্দু-শিখ- বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এঁরা অত্যাচারিত হয়েই এদেশে এসেছেন; সুতরাং তাঁরা 'শরণার্থী'; মুসলমানরা ওই দেশগুলিতে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে বিতাড়িত হননি। তাঁরা রোজগার অথবা জীবিকার্জনের জন্য অথবা অন্য উদ্দেশে এসেছেন। সুতরাং এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তাঁরা 'অনুপ্রবেশকারী'। তাই তাঁদের ফেরত পাঠানোরই কথা। আজকের দিনে বেশি জনসংখ্যা যে কোনও দেশেরই সমস্যা, এই সমস্যা কোনও দেশ বাড়তে দিতে পারে না; ভারতই বা দেবে কেন?

(লেখক প্রাক্তন ব্যাঙ্ক আধিকারিক ও ইতিহাস গবেষক)

দিদির নটে গাছটি মুড়লো

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

পাঁচ রাজ্যের ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব খুশি। এই জয়কে তিনি নিজের জয় বলেও চালাতে চাইছেন।

গত লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী ঝড়ের পরে এত বড় হার সত্যিই দেখতে হয়নি গেরুয়া শিবিরকে। স্বাভাবিক ভাবেই উৎফুল্ল বিরোধীরা। ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের ঠিক ছ'মাস আগে এই ফলাফল নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা শাসকদলের কাছে। একই ভাবে সদ্য একজোট হতে শুরু করা দলেদের কাছেও পর্যাপ্ত আনন্দ করার খবর।

কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কি সত্যিই খুশি হতে পারবেন? এই ফলাফলে বিজেপির যতটা হার, তার থেকেও বেশি জয় কংগ্রেসের। গত লোকসভা নির্বাচন তো বটেই এবং তার পর থেকে একের পর এক নির্বাচনে ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকা কংগ্রেস অনেক দিন বাদে অক্সিজেন পেল। তার থেকেও বড় কথা 'পাপ্পু' থেকে নেতা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অনেক কদম এগিয়ে গেলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী।

আর এখানেই যত চিন্তা। মূলত তৃণমূলনেত্রীর আগ্রহে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি বিরোধী দলের জোট তৈরির চেষ্টা চলছে। ফল ঘোষণার আগের দিনেই দিল্লিতে হয়েছে সেই জোট প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। আর এই জোট



প্রক্রিয়া নিয়ে বার বার উঠে আসছে একটাই প্রশ্ন— কে হবেন এই জোটের মুখ? কাকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করে ভোটের ময়দানে নামবে সম্ভাব্য জোট?

বিরোধীদের বৈঠকের শেষেও যে উত্তর অধরা ছিল, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মুখ হওয়ার দাবিদার হিসেবে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন রাহুল গান্ধী। এটাই তো ছিল বিজেপির চাওয়া। মোদী-শাহরা চান— লোকসভা নির্বাচন প্রধান দুই প্রতিপক্ষ হোক বিজেপির এনডিএ আর কংগ্রেসের ইউপিএ।

সুতরাং ফেডারেল ফ্রন্ট নামক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের নটে গাছটি কি মুড়লো?

দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশের ভোটের আগে বিজেপি-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে একটি অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন। ২১টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের বৈঠকে এমনই পরামর্শ দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। কিন্তু এখন সেই জোটের কাণ্ডারি হওয়ার বড়ো দাবিদার হয়ে উঠল বড়ো শরিক কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী।

একই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, এই রাজ্যের শাসকের জন্য এই ফল কোনও ভাবেই সম্পর্কিত নয়। যে যে রাজ্যে ভোট হয়েছে, তার সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ ও লড়াইয়ের কোনও মিলই নেই। উলটে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে কংগ্রেস মুছে যাওয়াটা বিজেপির জন্য সুবার্তা।

— **সুন্দর মৌলিক**

বালুচিস্তানে বিক্ষোভের অন্তরালে

অতিথি কলম

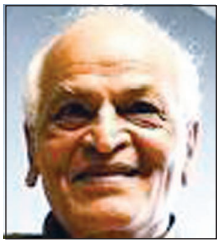

ড. সতীশ কুমার

ড. সতীশ কুমার

চীনের কর্তৃত্বে বালুচিস্তানের কেন্দ্রস্থলে চালু থাকা উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বালুচদের আদৌ সাহায্য করছে না। নিকট অতীতে পাকিস্তান সরকারকে এই সূত্রে নিশানা করার পর তারা চীনা সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াচ্ছে।

পাকিস্তানে স্থিত চীনা দূতাবাসে সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলা হয়। বালুচ লিবারেশন আর্মি সরাসরি এই হামলার দায় নিয়েছে। তারা ইসলামাবাদের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বালুচিস্তান চায়। একই সঙ্গে প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ইরান ও আফগানিস্থানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চালু থাকা চীনা প্রকল্পগুলিরও তারা ঘোরতর বিরোধী।

উল্লেখিত আক্রমণের প্রেক্ষিতে চীনা কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান সরকারের কাছে সে দেশে বসবাসকারী চীনা নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। ১৫ হাজারের বেশি উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তানি সৈন্য বালুচিস্তানে চালু থাকা চৈনিক প্রকল্পগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সদা প্রহরারত। ইতিমধ্যে চলতি বছরের শুরুর দিকে আই এস চীনের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। এর কারণ চীনের তরফে উইঘুর মুসলমানদের ওপর ঝিনঝিয়াং প্রদেশে নির্যাতন চালানোর প্রতিক্রিয়া। এই আক্রমণের অন্য একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে।

চীনের ওপর আক্রমণ :

পাকিস্তানে চালু থাকা চীনা প্রকল্পগুলির ওপর বালুচদের তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। এর সহজ কারণ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে উঠে আসা সুবিধের কোনও অংশই বালুচদের কোনও কাজে আসছে না। বিপুল সংখ্যক পাক সেনার নজরদারিতে চলা প্রকল্প অঞ্চলগুলিকে আদতে 'ব্যারাক' বলে মনে হচ্ছে। পাকিস্তানকে বরাবর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে গোপন সহায়তা করা চীনের ওপর নিজেদের কৃতকর্মই এমন বুমেরাং হয়ে আসছে। সম্প্রতি সমাপ্ত পাকিস্তানের নির্বাচনে জনতার একটা অংশ চীনের কার্যকলাপে ও প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। জনতার ক্ষোভ এই প্রকল্পগুলি থেকে উদ্ভূত চাকরি-বাকরি তারা কিছুই পাচ্ছে না, উপরন্তু এক ধরনের নব্য ঔপনিবেশিক জালে জড়িয়ে পড়ছে। ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার ব্যাপী বালুচিস্তানে পাকিস্তানি অধিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ। কিন্তু এই অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ও পাকিস্তানের অন্যান্য শক্তি (বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ) সংরক্ষণের উৎস। এখানেই পারস্য উপসাগর থেকে আসা খনিজ তেলের পথ। ঠিক যেখানে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানের সংযোগস্থলে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগতভাবে এই অঞ্চলের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রয়েছে। তাই এই অঞ্চলটি পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ৩৭০ মাইলের দীর্ঘতম আরবসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল পারতপক্ষে গোটা পাকিস্তানেরই উপকূলবর্তী এলাকা।

টাকা দিয়ে সন্ত্রাসীদের বশে রাখার মতলবে ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। তারই ইঙ্গিত রয়েছে বালুচ বিক্ষোভে। তারা পাকিস্তানের অন্য প্রদেশগুলির বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষদের নিয়ে রুখে দাঁড়ালে চীনের গোয়াদর বন্দর এলাকার মতলব মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।

অতীতে এই অঞ্চলে শাসন করে গেছেন সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা। ইতিহাসসিদ্ধ ভাবে একটি বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ভিত্তিক এক ধরনের শিথিল শাসনব্যবস্থার প্রদেশ ছিল এটি। কখনও পারস্য সম্রাটদের অধীনে, কখনও বা আফগান রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করত তারা। বালুচদের আদি জাতিসত্তার সঙ্গে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বসবাসকারীদের কোনও মিল নেই। অতীতে অনেকবারই তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। আধা বিদ্রোহে শামিল হয়েছে। তারা দাবি করে আসছে আরও বেশি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, এমনকী পাকিস্তানের বাইরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। যেখানে বালুচদের কথায় এই রাষ্ট্রে এক পতাকার নীচে মিলিত হবে ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে বসবাস করা ৫০ লক্ষ বালুচ। পাকিস্তান এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল যে বালুচিস্তানের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান তার যে কোনও পড়শী দেশের পক্ষেই অধিকার করার পক্ষে একটি লোভনীয় অঞ্চল। পাকিস্তানের কাছে বাস্তবে বালুচিস্তান এখন শাঁখের করাত।

অন্যদিকে, ভারতের কাছে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অসীম। কেননা ইরান বা মধ্য এশিয়া

থেকে গ্যাসের পাইপ লাইন এলে তাকে এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই আসতে হবে। এদিকে পাকিস্তানের শাসক সম্প্রদায়ের কর্তাব্যক্তিরা দেশে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি বজায় রাখার ভাবনায় যে কোনও ধরনের প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদের সূচনা বলে দাগিয়ে দিচ্ছে। প্রায় ৭০ বছরের পাকিস্তানি অস্তিত্বের মধ্যে বালুচরা বরাবরই মূলধারার বাইরে থেকেছে। দেখা যাচ্ছে কালক্রমে পাখতুনরা যখন মূল পাকিস্তানি সমাজের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে গেছে, তখন বালুচরা দূরে সরে গেছে।

বাস্তবে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখনই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে, জাতিসত্তার স্বীকৃতি চেয়েছে, তখনই পাকিস্তান এই সব ভাবনাকে দেশের বিপদ বলে চিহ্নিত করেছে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে কেবলমাত্র পঞ্জাবিরা ছাড়া পাখতুনি, সিন্ধি, বালুচ, মহাজিররা সকলেই নিজেদেরকে উল্লেখিত পরিচয়ে চিহ্নিত করে। পরে তারা পাকিস্তানি বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষরাই নিরন্তর একধরনের নির্যাতনের আতঙ্কে ভোগে। তারা মনে করে তাদের ওপর পঞ্জাবিদের তুলনায় বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে।

পাক সন্ত্রাসে চীনের মদত

নিরাপত্তা পরিষদে চীন ঠিক সময়ে ভোট দিয়ে পাকিস্তানের সমর্থনে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত লস্কর-ই-তৈবা ও এর সহযোগী সংস্থা জামাত-উদ-দাওয়া এই দু'টিই রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। চীন তার ভেটো প্রয়োগের অধিকার ব্যবহার করে পাকিস্তানে লস্করকে নিরাপদে রেখেছে। ভারতে ২৬/১১-এর নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হামলার আগে আন্তর্জাতিক পরিসরে চীন তিন তিন বার জামাত উদ দাওয়াকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ঘোষণা করায় বাধা দিয়েছে।

চীন একথা খুব ভালো করেই জানে যে, লস্কর-ই-তৈবা ও জামাত-উদ-দাওয়া-র পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পক্ষান্তরে তাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তদন্তকারী সংস্থাগুলির কী গভীর যোগসাজস রয়েছে। পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স (আই এস আই) এদেরই সহযোগী হিসেবে একত্রে প্ল্যান করে মুম্বই হামলা চালিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জইস-এ-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করার প্রস্তাবকেও চীন আটকে দেয়। নিরাপত্তা পরিষদে এই মার্কিনি প্রস্তাবের সমর্থনে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল যাতে মার্কিন প্রচেষ্টা বাড়তি মান্যতা পায়। এই সূত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের কারখানা। মার্কিন নৌসেনার এক অভিযানে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানেই বহাল তবিয়তে অবস্থান করছিল।

চীনের রাস্তা তৈরির মতলব বানচাল হতে পারে

চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক সংযোগ-পথ তৈরির মাধ্যমে বেজিং শুধু পাকিস্তান নয়, মার্কিন ও ভারতের মোকাবিলা করতে সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াতেই তাদের প্রভাব বাড়াতে চায়। চীন পাক ইকনমিক করিডোর (সিপিইসি) দক্ষিণ পাকিস্তানের বালুচ অঞ্চলে আরব সাগরে অবস্থিত গোয়াদর বন্দরের সঙ্গে পশ্চিম চীনের ঝিনঝিয়াং প্রদেশকে সংযুক্ত করবে। অতীতের সিল্ক রুট করিডোরের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে বালুচিস্তানের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। এই অঞ্চলটির মধ্যে দিয়েই যাবে উল্লেখিত সিপিইসি। সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ায় যাকে সংক্ষেপে ইউরোসিয়া বলা হয় উভয়কে যুক্ত করা এই অতিকায় প্রকল্পে ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ ধরা হয়েছে। এই বিস্তৃর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চলে প্রাধান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিন্তু জট আছে। চীনের কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই সন্ত্রাসী আই এস সংস্থার নজরে এসেছে। বিপদ সংকেত দেখা যাচ্ছে। গত বছরে সংগৃহীত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে আই এস চীনে বড়ো ধরনের রক্তপাতের বন্যা বইয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে।

৮০-র দশকে আমেরিকা যেমন ধনসম্পদের মদতে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, চীনের আজ সেই অবস্থা। চীন টাকা ছড়িয়ে সন্ত্রাসীদের কিনে নেওয়ার কথা ভাবছে। এমনটাই ভেবেছিল মার্কিনিরা, কিন্তু টুইন টাওয়ার ধূলিসাৎ হওয়ার পর তাদের ভুল ভেঙেছে। টাকা দিয়ে সন্ত্রাসীদের বশে রাখার মতলবে ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। তারই ইঙ্গিত রয়েছে বালুচ বিক্ষোভে। তারা পাকিস্তানের অন্য প্রদেশগুলির বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষদের নিয়ে রুখে দাঁড়ালে চীনের গোয়াদর বন্দর এলাকার মতলব মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।

(লেখক একজন পরিবেশবিদ এবং শুমাখার কলেজের প্রতিষ্ঠাতা)

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

রম্যরচনা

পাইলটের পরীক্ষা

নরেন্দ্র মোদী, মমতা ব্যানার্জি, চন্দ্রবাবু নাইডু এবং রাহুল গান্ধী একই প্লেনে সফর করছেন। প্লেন যখন মাঝ আকাশে তখন তেল ফুরিয়ে গেল। পাইলট এসে বললেন— 'এখুনি আমাদের প্লেন থেকে ঝাঁপ দিতে হবে।' কিন্তু দেখা গেল প্লেনে প্যারাসুট আছে মাত্র চারটি। অর্থাৎ একজন ঝাঁপ দিতে পারবেন না। একথা জানার পর প্রথমেই প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দিলেন মমতা ব্যানার্জি। তারপর চন্দ্রবাবু নাইডু। তারপর রাহুল গান্ধী। পড়ে রইলেন নরেন্দ্র মোদী এবং পাইলট। নরেন্দ্র মোদী পাইলটের দিকে প্যারাসুট এগিয়ে দিয়ে বললেন— 'আপনি প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আপনার পরিবার আছে। আমার কোনও পিছুটান নেই।' পাইলট স্মিত হেসে বললেন— 'না স্যার। প্লেনে তেল ভরতিই আছে। আসলে আমি পরীক্ষা করছিলাম কে অন্যের জন্য জীবন দিতে পারে।'



উবাচ



"রাফাল নিয়ে এক বছর ধরে দেশের মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে রাহুল গান্ধী তথা কংগ্রেস। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে সব মিথ্যার পর্দা ফাঁস হয়ে গিয়েছে।"

স্মৃতি ইরানি
কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী

রাফাল ইস্যুতে কংগ্রেসের মিথ্যাচার প্রসঙ্গে



"তীর্থযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এবং চলতি মরশুমে পর্যটকদের আরও আকর্ষণ করতে দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে প্রয়াগ কুম্ভমেলায় যাওয়ার জন্য ভারতীয় রেল মাত্র পাঁচ টাকা ভাড়া ধার্য করেছে।"

পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী

আসন্ন কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে এক ট্যুইট বার্তায়



"কোনো বিদেশি অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতে থাকার অধিকার দাবি করতে পারেন না। তাঁদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়া উচিত।"

তথাগত রায়
রাজ্যপাল, মেঘালয়

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে



"আজ সাজা পেয়েছেন সজ্জন কুমার। এর পর পাবেন জগদীশ টাইটলার। তারপর কমলনাথ। আর শেষে সমগ্র গান্ধী পরিবার।"

হরসিমরত কাউর
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা
অকালি নেত্রী

৮৪'র শিখ গণহত্যায় দিল্লি হাইকোর্টের রায় প্রসঙ্গে

কোচবিহারে বিজেপির সভার জেরে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৃণমূল কংগ্রেসে

সাধন কুমার পাল

গত ৭ ডিসেম্বর কোচবিহারের ঝিনাইডাঙায় বিজেপি 'গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা' অর্থাৎ 'রথ যাত্রার' উদ্বোধনী জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশের পর সভা হবে কিনা, যাত্রার উদ্বোধন করতে অমিত শাহজী আসবেন কিনা এই সমস্ত বিষয় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। বিভ্রান্ত হয়ে পড়া বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব সভা নিয়ে সাধারণ কর্মীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলেন না। একদিকে প্রশাসন অনুমতি দেয়নি, অন্যদিকে ৬ ডিসেম্বর বিকেলে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্রেকিং নিউজ, উচ্চ আদালতের সিঙ্গেল বেঞ্চ আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বিজেপির রথযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়া এটাও প্রচার করছে যে বিজেপির আইনজীবীরা প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয়েছেন, রথযাত্রা নিয়ে বিজেপির আবেদন শোনার জন্য রাতেই স্পেশাল কোর্ট বসতে পারে, প্রয়োজনে বিজেপি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই টান টান উত্তেজনার মধ্যে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে বলতে শোনা যাচ্ছে আগামীকাল অর্থাৎ ৭ তারিখ রথযাত্রার সূচনা হচ্ছেই, অমিত শাহজীও সভায় আসছেন। সুতরাং সভা হচ্ছেই।

এদিকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ৬ তারিখ বিকেলে কোচবিহার শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটেয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে যাওয়ার পথে মাথাভাঙ্গার সিতাই মোড়ে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীর হাতে দিলীপ ঘোষের কনভয় আক্রান্ত হওয়ার দৃশ্য লাইভ দেখাতে শুরু করেছে। সিতাই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিবেদক জানাচ্ছেন পুলিশের সঙ্গে কালো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূলিরা দিলীপ ঘোষের কনভয়ে হামলা চালিয়ে ওই কনভয়ের প্রত্যেকটি গাড়ি ভেঙে দিয়েছে। সেই ভাঙা গাড়ি নিয়েই দিলীপ ঘোষ মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটেয় পৌঁছে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর আয়োজিত সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, উত্তরবঙ্গের প্রাণপুরুষ মনীষী পঞ্চানন বর্মাকে শ্রদ্ধা জানানোর অধিকার সবার আছে। সুতরাং এই আক্রমণ মনীষী পঞ্চানন বর্মার প্রতি অশ্রদ্ধার নিদর্শন তথা রাজবংশী সমাজের উপর আক্রমণ।

এদিকে বিভিন্ন স্থান থেকে খবর আসতে শুরু করেছে কোচবিহার জেলার সর্বত্র পুলিশ নাকা চেকিং শুরু করেছে। গাড়ি থামিয়ে ভ্রমণরত মানুষকে পুলিশ তাদের গন্তব্য জিজ্ঞেস করছে। অভিযোগ রাতভর কোচবিহার জেলার সর্বত্র নাকা চেকিং চালানো হয়েছে। এই নিয়ে পুলিশ মহলেও চাপা বিক্ষোভ ও বিরক্তির খবরও বিভিন্ন মহলে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। পরেরদিন অর্থাৎ ৭ তারিখ ভোরবেলা থেকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার-সহ কোচবিহারে সমস্ত গ্রামীন ও শহুরে এলাকা থেকে খবর আসতে শুরু করে যে পুলিশ কোচবিহারের জনসভামুখী সমস্ত গাড়ি আটকে দিচ্ছে। ৭ ডিসেম্বর সকাল থেকে কোচবিহার জেলা জুড়েই টান টান উত্তেজনা। এ যেন এক অভূতপূর্ব জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি। মঞ্চ বাধাই ছিল, সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রশাসন বিজেপির জনসভার জন্য কোচবিহারে কোনও মাঠের অনুমোদন দেয়নি। ফলে কুচবিহার শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে এক বিজেপি সমর্থকের ৭ বিঘে চাষের জমিকেই সভাস্থলের উপযোগী করে তৈরি করে। প্রায় ১০ দিন ধরে বিজেপির যুবমোর্চার সদস্যরা রাতদিন পাহারা দিয়ে যাচ্ছিলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলমুখী মানুষের ঢল নামতে শুরু করে। দুপুর নাগাদ সভাস্থল কানায় কানায় ভর্তি হয়ে জাতীয় সড়কের ধারে শুধু মানুষ আর মানুষ। সকালবেলা কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সভাস্থলে পৌঁছান। প্রথমে স্থানীয় নেতারা সমবেত মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে দিলীপ ঘোষ মঞ্চে উঠে দূরদূরান্ত থেকে সভায় আগত মানুষদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন, বিজেপি আইন মেনে চলা রাজনৈতিক দল, সেজন্য আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকার জন্য সভা স্থগিত রাখা হচ্ছে। তবে আদালতের অনুমতি



পেলেই নির্ধারিত সূচি অনুসারে অমিত শাহজীর সভা এবং গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র উদ্ধারে বদ্ধপরিকর। রাজ্য সভাপতি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে বিজেপি বাংলাদেশ থেকে আগত সমস্ত উদ্বাস্তু হিন্দুকে নাগরিকত্ব প্রদান করতে বদ্ধপরিকর এবং এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানদের তাড়িয়ে ছাড়বে।

সভার ভিড় দেখে বিজেপি নেতারা যেমন আপ্লুত তেমনি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ভয় এই জন্যই যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রশাসন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েও সভাস্থলে মানুষের উপস্থিতি রুখে দিতে পারেনি। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দলের বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের নেতাদের সতর্কবার্তা দেয় যে সমস্ত এলাকা থেকে মানুষ বিজেপি সভায় আসবে সেই সমস্ত এলাকার নেতাদের পদ কেড়ে নেওয়া হবে। এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে যে, পুলিশ ও তৃণমূল নেতারা এক সঙ্গে বৈঠক করে বিজেপির এই সভা ভণ্ডুল করার রণকৌশল তৈরি করেছিল। তৃণমূলেরই এক সূত্রের খবর, মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য ৬ ডিসেম্বর দিলীপ ঘোষের উপর আক্রমণের সূচনাও পুলিশকে সঙ্গে নিয়েই করা হয়েছিল। দিলীপ ঘোষের উপর আক্রমণ চলার সময় পুলিশের নিস্ক্রিয়তা তৃণমূল ও প্রশাসনের যৌথ ষড়যন্ত্রের অভিযোগের সপক্ষে বড় প্রমাণ।

৭ ডিসেম্বর কোচবিহারে বিজেপির সভা যে তৃণমূলের অন্দরমহলে গৃহযুদ্ধের সূচনা করেছে তার আভাষ সেদিন রাত থেকেই আসতে শুরু করে। কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের ফেসবুক পোস্টে জানা যায় যে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা নেতা নিশীথ প্রামাণিককে কোনও কারণ না দেখিয়েই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নেতা হিসেবে নিশীথ প্রামাণিকের এতটাই দাপট যে কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমায় 'মাদার' তৃণমূল অস্তিত্ব শূন্য হয়ে যুবরাই সমস্ত ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। এলাকার মানুষের বক্তব্য বেতাজ বাদশা নিশীথ প্রামাণিকের এলাকায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডিএম, পুলিশ সুপার এদের কারো ফরমানও চলতো না। মন্ত্রীর চেয়ে বড় কনভয় নিয়ে চলা ফেরা করতেন নিশীথবাবু। শোনা যায় এবারের গণেশ চতুর্থীতে কোটি টাকা খরচ করে গণেশ পুজো করে তৃণমূলের সমস্ত স্তরের নেতাদের টেক্কা দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নিশীথ বধের পরিকল্পনা করছিলেন। তৃণমূলেরই একটি সূত্র বলছে, ৭ ডিসেম্বর বিজেপি সভায় অভূতপূর্ব জনসমাবেশ রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সামনে বড়ো সুযোগ এনে দেয়। বিজেপির এই সফল সভার দায় নাকি সম্পূর্ণ ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় নিশীথ প্রামাণিকের ঘাড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানির তরফ থেকে মমতা ব্যানার্জিকে নাকি বোঝানো হয় যে তৃণমূলের বর্তমান নেতৃত্বকে বেকায়দায় ফেলতে নিশীথই নাকি বিজেপির সভার মাঠ ভরিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এত বড়ো 'বেয়াদপির শাস্তি' হিসেবে নিশীথের ঘাড়ে নেমে এল বহিষ্কারের খাড়া। নিশীথের বহিষ্কারের পর জেলা জুড়ে শুরু হয়ে যায় খণ্ডযুদ্ধ। তৃণমূল ও যুবর সংঘর্ষে জলিলের সমর্থকরা যেমন আওয়াজ তুলেছিলেন 'রবি ঘোষের চামড়া তুলে নেব আমরা', ঠিক তেমনি আবার মন্ত্রীর চামড়া তুলে নেওয়ার আওয়াজ উঠে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায়। এই গৃহযুদ্ধ কতদূর গড়াবে সে অবশ্য ভবিষ্যতেই বলবে।

২০১১ সালে পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসার সময় মমতা ব্যানার্জির জনসভাগুলিতে ভিড় উপচে পড়তো। সিপিএমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মানুষ ছুটে যেতো মমতা ব্যানার্জির কথা শোনার জন্য। সে সময় সিপিএমের অপশাসনে মানুষ এতটাই তিতিবিরক্ত ছিল যে কোনও মূল্যে মানুষ সিপিএমের অপশাসন থেকে মুক্তি চাইছিলেন। ফলে মমতা ব্যানার্জিকে ঘিরে পরিবর্তনকামী মানুষের উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তিনি কী বলছেন বা কী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আদৌ সেগুলি বাস্তব সম্মত কিনা সেগুলি বাস্তবের কষ্টি পাথরে বিচার করার যাচাই করার ধৈর্য পর্যন্ত মানুষের ছিল না। ৭ ডিসেম্বর বিজেপির সভা ২০১১ সালে প্রাক পরিবর্তন জনসভাগুলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে সেই উন্মাদনার স্মৃতি ফেরাল। তবে এবারের উন্মাদনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ঘিরে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের উন্মাদনায় তৃণমূল অশনি সংকেত দেখতে শুরু করেছে। ৬ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর সিঙ্গল বেঞ্চে রথযাত্রা ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস স্বস্তিতে ছিল। কিন্তু পরেরদিন বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার এবং বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায় পাল্টে দেয়। দু'মাস ধরে বিজেপির আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় রাজ্য সরকারকে ডিভিশন বেঞ্চের কাছে তিরস্কৃত হতে হয়। ডিভিশন বেঞ্চের যা রায় তাতে রথযাত্রা হচ্ছেই। বিজেপির পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে রথযাত্রা বাতিল নয়, স্থগিত রাখা হয়েছে। এই লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত বিজেপি পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করে রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলেও যাতে বিজেপির আবেদন অগ্রাধিকার পায়। ঘটনাক্রম থেকে এটা পরিষ্কার, রাজ্যসরকার যতই শক্তি এবং অপশক্তি নিয়ে মাঠে নামুক না কেন ভারতীয় জনতা পার্টি তৃণমূলকে এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। অমিত শাহও ঘোষণা করে দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে এই ধরনের কার্যক্রমে প্রশাসনের অনুমতি লাগবে না, জনগণের অনুমতি নিয়েই বিজেপি মাঠে নামবে। একদিকে ডিভিশন বেঞ্চের রায়, অন্যদিকে পারলে রুখে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনটি রথযাত্রাই হচ্ছে এবং তিনি নিজে উদ্বোধন করবেন বলে মমতা ব্যানার্জিকে দেওয়া অমিত শাহের সরাসরি হুংকারে আপাতত ব্যাকফুটে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে আদালতে এবং জনগণের আদালতে এই পরাজয়ের দায় চাপাতে গিয়ে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৃণমূলের অন্দরে। ■

সাজঘরে সাজবদল

‘নেত্রী’ এখন দুর্গানাম জপিতেছেন

সুজাত রায়

সাজঘরে এখন সাজবদলের শোরগোল। ধরাচূড়া ছাড়িয়া তিনি এখন ‘হিন্দু রমণী’ হইয়া উঠিতে বড়ই বাগ্র। তাই রথযাত্রার বিকল্প যাত্রা হিসাবে তিনি ‘পবিত্রযাত্রা’র ঘোষণা করিয়াছেন। পবিত্রযাত্রা—নামকরণটি বড়ই মধুর। কিন্তু যাত্রাপালাটি কেমন ছিল?

নেত্রীর ঘোষণা ছিল ঃ যে দিবসে যে এলাকা দিয়া বিজেপির রথযাত্রা যাইবে, তাহার ঠিক পর দিবসে ওই একই পথে পবিত্রযাত্রা হইবে। লালপাড় শাড়ি পরিয়া পবিত্র গঙ্গাজল বা গোবরজলপূর্ণ মঙ্গলঘট হইতে মহিলারা আম্রপল্লব হস্তে জল ছিটাইয়া রাস্তা শুদ্ধ করিবেন। প্রতি দশজনের পর একজন মহিলার হস্তে থাকিবে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার কাটআউট। ওই কাটআউটের নীচে লিখিয়া দেওয়া হইবে—‘ওরা ঠাকুরকে রথ হইতে নামাইয়া নিজেরাই রথে উঠিয়াছেন, আমরা সেই ঠাকুরকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াছি।’ পরের সারিতে মহিলারা শঙ্খনাদ তুলিয়া হাঁটিতে থাকিবেন। তাহার পরের সারিতে থাকিবেন পুরুষগণ। তাঁহারা মহা সোরগোল তুলিয়া কাঁসর, ঘন্টা, খোল-করতাল বাজাইতে বাজাইতে হাঁটিবেন। ইহাই পবিত্রতার শেষ দৃশ্য নহে। ক্লাইম্যাক্স হইল ঃ পবিত্রতার অংশ নেওয়া প্রত্যেকের স্বহস্তে থাকিবে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর ছবিসহ তৃণমূলি পতাকা।

পবিত্রতার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইহাই—নেত্রীর প্রচার। দলের নহে। মাননীয়া দীর্ঘ বিশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া যবনদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন। তাই তিনি কথায় কথায় আল্লার দোয়া মাঙ্গেন, যবনদিগের সহিত গলা মিলাইয়া নমাজ পড়েন, মাথায় ঘোমটা



দিয়া, শাড়ির বোরখায় ঢাকিয়া মসজিদেও যান। ভোট বড় বালাই তাই সংকোচ, দ্বিধা, লজ্জা-শরম ত্যাগ করিয়া তিনি যবনদিগের ধর্মীয় পণ্ডিতদের হাতে জোর করিয়া মাসোহারা গুঁজিয়া দেন। দরিদ্র হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। তিনি রোহিঙ্গা যবনদিগের জন্য দুই হস্ত বাড়াইয়া দেন। তাহাদের সাদরে অতিথি হিসাবে বরণ করেন নিজ রাজ্যে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকরী (অধিকাংশ যবন গোষ্ঠীভুক্ত) জনগণের জন্যও তাঁহার দরদের সীমা পরিসীমা নিরূপণ করা যাইবে না। ফলে সেটা দেশের মধ্যে প্রতি বৎসর লাফাইয়া লাফাইয়া সবচাইতে বেশি হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দায় পশ্চিমবঙ্গের ওপর বর্তাইলেও মাননীয়ার মনঃসংযোগ অন্যদিকে ন্যস্ত হয় নাই কারণ একটাই, ভোট বড় বালাই। তবে কলিকাতা পুরসভার ঐতিহ্যময় এবং সমৃদ্ধ মেয়রের পদাসনে তিনি তাঁহার চোখের মণি ভাই ফিরহাদ হাকিমকে বসাইতে দ্বিধা করেন নাই। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মাস দুয়েক আগেই কলিকাতায় এক ইমাম সমাবেশে দাবি তোলা হইয়াছিল যে কলিকাতা শহরের মেয়র পদে কোনও যবনকে অভিষিক্ত করিতে হইবে। আরও দাবি ছিল যে, কলিকাতা পুলিশের কমিশনার পদেও যবনকেই বসাইতে হইবে। মাননীয়া প্রথম দাবিটি মানিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয় দাবিটি কবে মানিবেন, তাহার জন্য কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ অপেক্ষমাণ। পাঠকদিগের অবশ্যই স্মরণ আছে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময়ও কলিকাতার মেয়র পদাসনে ছিলেন মোহম্মদ উসমান আর বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন শ্রীসুরাবর্দি। স্বাধীনতার পর এই প্রথম পুনরায় সেই ইতিহাস ফিরিয়া আসিতে চলিয়াছে।

কিন্তু আচমকাই সাজঘরে রদবদল ঘটিয়াছে। নেত্রী এখন ঘোর হিন্দু হইতে চাহেন। কারণ রাজ্য জুড়িয়া নাকি গেরুয়া ধুলার প্রকোপ বড় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া বিজেপি-র রথযাত্রা ঘোষণার পর হইতেই। ভোট বড় বালাই। জাত, কুল তো আগেই গিয়াছে—এখন হিন্দু না হইলে মানটুকুও ধরিয়া রাখা যাইবে না। অতএব নতুন স্লোগান সেই হিন্দি সিনেমার ‘মেরা

মা হ্যায়' ডায়লগের মত। নেত্রী হুঁংকার দিয়াছেন—''ওদের (পড়ুন বিজেপি-র) রাম আছে, তাতে কী ? আমাদিগের মা দুর্গা আছেন।' এতদিন পড়িয়াছিলেন কাবার শিলাতলে। এখন গিয়েছেন কৈলাশ পদতলে। তা ভালো, কিন্তু ধর্মে মতি থাকলে মন উন্নত হয়।

অগত্যা শুরু হইয়া গিয়াছে শিয়ালের এক রা। দিদির ভাইয়েরাও এখন সব রাতারাতি অতি বৃহৎ হিন্দু হইয়া উঠিয়াছেন। যেমন আসানসোল পুরসভার মেয়র এবং বিধায়ক জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি ঘোষণা করিয়াছেন, আসানসোল–দুর্গাপুরের হিন্দিভাষী জনসমূহ এলাকায় ২ কোটি অর্থ ব্যয়ে ১০খানি সূর্যমন্দির তৈয়ারি করিবেন আগামী ছটপুজার বহু পূর্বেই। প্রতি মন্দিরের জন্য ব্যয় হইবে বিশ লক্ষ টাকা। তোলাবাজি শুরু হইয়া গিয়াছে। ডিজাইনও প্রায় প্রস্তুত। সরকারিভাবে পুরসভা পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সর্বাবিধ সাহায্যের হস্ত বাড়াইয়া দিবে।

তা রাতারাতি এই পরিবর্তন কোন কারণে?

বুঝাইয়া বলিবার বোধহয় অবকাশ নাই যে, তৃণমূলিরা এখন ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ গত সাত বৎসর ধরিয়া ঘাসফুলের সরকার প্রশাসনটিকে রীতিমতো সার্কাসের দলে পরিণত করিয়াছে। আর টিকিট কাটিয়া (পড়ুন ট্যাক্স দিয়া) জনগণ সেই সার্কাস দেখিতেছেন। তবে এ সার্কাসের চরিত্র একটু ভিন্নতর। এই সার্কাসের কুশীলব সব জোকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অতএব জনগণ উপভোগ করিতেছেন। আর মনে মনে ভাবিতেছেন, ঢের হইয়াছে। হাসিতে হাসিতে বমি হইবার উপক্রম। এইবার নতুন পথের সন্ধান করতেই হইবে।

পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ—সর্বত্র হাটে-বাজারে, বাসে-ট্রেনে মুড়ি আর মুড়কি যে এক জিনিস নহে তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। কেহ বলিতেছেন, ছাড়েন ওসব। লাল দেখিয়াছি, সবুজও দেখিলাম। বহুপূর্বে সাদাও দেখিয়াছি। গাই-বাছুর, হস্ত, কাস্তে-হাতুড়ি, লাঙল, সিংহ সবাইকে চিনিয়া গিয়াছি। ঘাসফুলকেও চিনিলাম। এবার না হউক চেনা যাক গেরুয়া পদ্মকেই। মানুষের মেজাজ পড়িতে শুরু করিয়াছেন নেত্রী। বেশিদিন আর এ নাটক চলিবে না, তা স্পষ্ট হইয়াছে তাঁহার কাছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোস পরিয়া সংখালঘু তোষণের রাজনীতি যে ধরা পরিয়া গিয়াছে, তা তিনি এখন মোক্ষম বুঝিয়াছেন, যেমন বুঝিয়াছিলেন জাল ডক্টরেট ডিগ্রি ধরা পড়িবার সময়। এও বুঝিয়াছেন—একে একে নিভিছে দেউটি। মুকুল গিয়াছেন, সাধের কানন গিয়াছেন। বাকিরা লম্বা লাইনে অপেক্ষমান। ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। অতএব সাজবদল করিতে হইবে। হিন্দু হইতে হইবে। বিজেপি-কে হারাইতে হইবে। আর তাহা করিতে হইলে বিজেপির মতোই গেরুয়াধারী হইতে হইবে।

ভয় না পাইলে মানুষ কি দুর্গানাম স্মরণ করেন? মাননীয়া এবার সত্যসত্যই ভয় পাইয়াছেন। তাই দুর্গানাম জপিতেছেন। গোবরজল, গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া নিজেকে শুদ্ধ করিতেছেন। সূর্যমন্দিরের টোপ দিয়া বাবুল সুপ্রিয় বিরোধী ভোটারদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে উৎসাহ জোগাইতেছেন।

নাটকের মঞ্চের পর্দা ধীরে ধীরে সরিতেছে। তিনি আসিতেছেন নতুন ভূমিকায়। মা মাটি মানুষের শ্লোগান আর নয়—এবং শ্লোগান দুর্গানাম। হয়তো খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে তাঁর নতুন দুর্গাস্তোত্রের অ্যালবাম—জয় জয় দুর্গা।

কিন্তু তাহাতেও কি শেষ রক্ষা হইবে? সম্ভবত না। কারণ এই মুহূর্তে গোটা রাজ্যের মানুষ তৃণমূলী আফিমের নেশা কাটাইয়া জাগিতেছেন। নেত্রীর চ্যালা-চামুন্ডাদের জালিয়াতি, তোলাবাজি, গুন্ডামি, ভ্রষ্টামি, দালালি, অসভ্যতা, নোংরামি—সরকারের অপশাসন, নেত্রীর বিসদৃশ ভয়াল মুখব্যাদানে ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালি রীতিমতো বীতশ্রদ্ধ। জবাব দিবার জন্য মানুষ যত বেশি উন্মুখ, ইতঃপূর্বে কখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই।

নেত্রী নিজেও তাহা বোঝেন আর বোঝেন বলিয়াই দাবার পাশা পাল্টাইতে বসিয়াছেন। এতদিন তিনি বদলের শ্লোগান তুলিয়া, পরিবর্তনের বুলি আউড়াইয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবার মানুষ তাঁহাকেই বদলাইতে প্রস্তুত। ১৯শে না হোক, ২১শে বটেই। মঞ্চ প্রস্তুত। কুশীলবরাও হাজির। এইবার শুধু ঝড় উঠিবার অপেক্ষা। গেরুয়া ধুলার ঝড়। পূর্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে। ■

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।



তুমি-আমি এক রক্ত

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

১৬১/১ এম জি রোড, রুম নং ৫১
বাঙ্গুর বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭
ফোন : ২২৬৮০৯৬২, ২২৭৩৫৭৯২
E-mail : kalyanashram.kol@gmail.com

দেশকে উন্নত করার প্রথম শর্ত হলো শক্তিশালী স্থায়ী সরকার

প্রীতীশ তালুকদার

অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, সমস্যা আছে, অভাব আছে, আছে অনেক যন্ত্রণা। মহারাষ্ট্রের চাষিদের পেঁয়াজ উঠতেই তা পঞ্চাশ পয়সা কিলো। লাভ তো অনেক দূর, ডাহা লোকশান। খোরাক পরে, আগে চাষের দেনা মিটবে কী করে? টমেটোর দামও পাচ্ছে না। উত্তরপ্রদেশের চাষিরা আখের দাম পাচ্ছে না। পঞ্জাবের চাষিরা গমের দাম পাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের চাষিরা পাট-ধান-আলুর দাম পাচ্ছে না। চাষিরা দেনায় ডুবে যাচ্ছে। ফসল ছিটিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখাচ্ছে। আত্মহত্যা করছে। দায়ী কে?

ওই যে মোদী! গরিব বিরোধী বিজেপি সরকার; ওরাই দায়ী। হঠাৎ এই চার বছরে যেন বিশাল বিশাল অট্টালিকা ধুলিসাৎ, কলকারখানা সব উবে গেছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানীরা মুর্খ হয়ে গেছে। ফসলের উর্বর জমি সব বন্ধ্যা হয়ে গেছে। সোনার ফসল ফলিয়ে কুঁড়ে ঘরকে প্রাসাদ বানানো চাষিরা হঠাৎ ভিখারি হয়ে গেছে। শিল্পপতিরা দেউলিয়া হয়ে গেছে। দেশটাও ফতুর হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে। কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল আর যত ভামেরা মিলে ২০১৪ সালে শ্রী মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি দিল্লির বসার পর থেকে না বসতে এমন হুক্কাহুয়া শুরু করেছে যে দেখে মনে হচ্ছে ওরা ছেষট্টি বছর ধরে ক্ষুধাহীন, অশিক্ষাহীন, সন্ত্রাসহীন সোনার ভারত গড়েছিল। সকলে সোনার থালায় খাচ্ছিল আর রুপোর গাড়ু নিয়ে প্রাতঃকৃত্য করতে যাচ্ছিল। বিজেপি এসেছে আর সব গেছে। মোদী দেশটাকে ঝাঁকায় তুলে সোমালিয়া বা ভেনেজুয়েলায় বেচে এসেছে যেন।

একটু উল্টো দিক থেকে দেখা যাক। ভারত আজ মহাকাশ গবেষণায় প্রভূত উন্নতি করেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি-সহ বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলো স্যাটালাইটি উৎক্ষেপণে ভারতের সাহায্য নিচ্ছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত অন্যতম শক্তিশালী দেশ। ভারতের অর্থনৈতিক ভিতও বেশ শক্ত। এ রকম বহু কিছু আছে যা সার্থক ও গর্বের। এসব কি এই বিজেপি সরকার ও মোদীজীর এই চার বছরের অবদান?

অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারে এলেন আর পরীক্ষামূলক পোখরান পরমাণু বিস্ফোরণ করে ফেললেন বিজ্ঞানীরা আর টপাটপ পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হয়ে গেল! মোদিজী এলেন আর ইসরোর রকেট গাদা গাদা স্যাটেলাইট বগলে নিয়ে মহাকাশে ছুটতে শুরু করল! তা হয় না। এসব বহু বছর ধরে সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফল। তাতে দীর্ঘ ষাট- পঁষট্টি বছরের সরকারের অবদান আছে। হতে পারে, আরও এগোনো উচিত ছিল, মোদীজী আসার পর তা ত্বরান্বিত হয়েছে। তেমনই বেকার সমস্যা, চাষির অবস্থা, ব্যবসার বেহাল দশাও স্বাধীনতা থেকে দীর্ঘ ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের অবহেলা আর শোষণের ফল, নাকি এই চার বছরে মোদী সব করে দিল তা ভাবতে হবে।

গত সপ্তাহেই বিশ-বাইশ টাকা কিলো আলু কিনলাম। আজ কিনলাম আট টাকা কিলো। আলু ওঠার সময় যত এগিয়ে আসবে ততই আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে আলুর দাম পড়তে থাকবে। ঠিক যখন চাষিরা জমি থেকে আলু তোলা শুরু করবে তখন বাজারে আলুর দাম দাঁড়াবে দুই থেকে চার টাকা, আর চাষির পাইকারি দাম হবে পঞ্চাশ পয়সা থেকে দু' টাকা। ওরা লোকসানে পড়ে হা-হুতাশ করবে, দেনার বহরে ছটফট করবে। ওদিকে যেই চাষির জমির আলু শেষ হয়ে যাবে তখন শুরু হবে সাধারণ ক্রেতাদের চোষা। তর্ তর্ করে আবার বিশ-বাইশ বা পঁচিশ টাকা ছোঁবে।

সিমলায় কেউ এয়ার কুলারের ব্যবসা করতে যাবে না, থর মরুভূমিতে কেউ বালির ব্যবসা করতে যাবে না। উৎপাদন ও বাজার পরস্পরের পরিপূরক। সিমলাতেও কুলারের ব্যবসা করা যেতে পারে যদি তা ঠিকঠাক চাহিদাযুক্ত স্থানে পৌঁছে দেবার কাঠামো থাকে।



ফাইল চিত্র

আবার, চাহিদা আছে অথচ তুলনায় উৎপাদন কম হলে দ্রব্যের মূল্য বেশি হবে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন আছে, চাহিদাও আছে অথচ সেই উৎপাদিত দ্রব্য ঠিকঠাক বাজারজাত করা, প্রসেসিং ও প্যাকেজিং করা এবং চাহিদা মতো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা না থাকলেও উৎপাদিত দ্রব্য মূল্য না পেয়ে মার খাবে। উৎপাদকেরা ক্ষতির মুখে পরবে। যার ফল স্বরূপ মহারাষ্ট্রের চাষিরা পঞ্চাশ পয়সা কিলো দরে পেঁয়াজ বেচতে বাধ্য হচ্ছেন, এদিকে আমরা একই সময়ে বিশ টাকা কিলো দরে পেঁয়াজ কিনতে বাধ্য হচ্ছি।

উৎপাদন ও উৎপাদিত ফসলের সুষম বণ্টন এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য তিল তিল করে গড়ে তুলতে হয় যথাযোগ্য পরিকাঠামো। চাষিদের এই সমস্যা তো আজকের নয়, স্মরণকাল থেকে বছর বছর শুনে আসছি। মহারাষ্ট্র, বিশেষ করে নাসিক জেলায় প্রচুর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। তা কেনা ও দ্রুত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্য কী স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনও পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে? হলে এমনটা হতো না, সবটাই গতানুগতিক ফড়ে-নির্ভর হয়ে আছে। আখ, গম, পাট, সব ক্ষেত্রেই তাই।

গত বছরে এই পশ্চিমবঙ্গে আলু নিয়ে হৈ চৈ অনেকের মনে আছে নিশ্চয়ই। পুজোর আগে থেকেই আলু অগ্নিমূল্য, তাতে গৃহী ক্রেতাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। একদিকে লক্ষ লক্ষ টন আলু গুদামে মজুদ করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে আমাদের লুট করা হচ্ছে, অপর দিকে সেই মজুদ আলুই ঠিক আলু ওঠার মুখে বেশি করে বাজারে ছেড়ে দিয়ে দাম ফেলে দেওয়া হলো যাতে আলু চাষিরা কম দামে আলু বেচতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীরা মুখে খুব তরপেছে, কিচ্ছু করতে পারেনি বা করেনি। পাট বাংলার অর্থকরী ফসল হওয়া সত্ত্বেও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন নিয়ে গবেষণাতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি এ রাজ্যের এত দিনের বাম সরকার ও আজকের তৃণমূল। উপরন্তু ইউনিয়নবাজি, তোলাবাজি আর ধর্মঘট করে করে হাওড়া-হুগলীর পাটকলগুলোর গঙ্গাযাত্রা করে দেওয়া হয়েছে। চাষিরা দাম পাবে কোথা থেকে? আলু ছাড়াও আম, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের প্রচুর উৎপাদন হয় এখানে। এগুলোকে আচার, জুস, জেলি, চিপস্ ইত্যাদি বা আরও নতুন কিছু রেডি ফুড হিসাবে বাজারজাত করার জন্য আজ পর্যন্ত কোনও গবেষণার উদ্যোগ নেয়নি সরকার। নিলে জেলায় জেলায় উদ্যোগ ও কারখানা গড়ে উঠলে চাহিদা থাকত, মূল্য থাকত, চাষিরা নিজেরাই নিজেদের উৎপাদনকে সঠিক স্থানে বেচতে পারত বা বাজারজাত করতে পারত। লাভ তুলতে পারত। চাষিকে লাভযুক্ত মূল্য দিতে হবে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে লাভ দিতে হবে, আবার ক্রেতাকে সস্তা মূল্যে দিতে হবে। কাজটা সহজ নয়। উৎপাদক, খুচরো ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সকলেই ভুগছে— ফাটকাবাজ, কালোবাজারি আর রাজনীতিকরা ফুলছে।

সমস্যাটা এক জায়গায় আটকে নেই। বেকার সমস্যা মাথার উপর দিয়ে বইছে। চাকরি ক্ষেত্রে অজস্র পদ খালি। চাকরি দিতে গেলে টাকা দরকার। সরকারের আয় দরকার। সেখানে ট্যাক্স ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি যে তাতে সরকারের ভাঁড়ার পূর্ণ হবে আর নতুন নতুন চাকরি হবে।

চাষিদের লোকসান হবে আর সরকার দেশের কোষাগার থেকে ভরতুকি দেবে, বেকারদের চাকরি দিতে পারবে না তাই ভাতা দেবে, দেশের মানুষ দরিদ্র তাই ভরতুকিতে রেশন দেবে, গ্যাস দেবে, এটা বিশেষ সময়ে বিশেষ ক্ষেত্রে হতে পারে, নিয়মিত ব্যবস্থা হতে পারে না। কোষাগারের পয়সা দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যয় হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র, মানব সম্পদকে উপযোগী করে গড়ে তোলা ও তাদের যথাযোগ্য ব্যবহারের ক্ষেত্র বা পরিকাঠামো গঠন সরকারের কাজ। সরকারি সিস্টেমকে সৎ, দ্রুত ও উপযোগী করা, রেল ও সড়ক পরিবহণের উন্নতি করা সরকারের কাজ। নতুন নতুন পথ দেখানো ও সে পথে তাদের সহযোগিতা করা সরকারের কাজ। ভরতুকির দয়া নয়, নিজে পায়ে দাঁড়াতে শেখানোটা সরকারের কাজ। আর সরকারের দান-দাক্ষিণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা নাগরিকের কাজ নয়। মাথা উঁচু করে ট্যাক্স দিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নে সরকারের সঙ্গী হওয়াটাই সুনাগরিকের কাজ। সেটাই স্বাধীনতা লগ্ন থেকে শুরু করে ২০১৪ পর্যন্ত হয়নি। তাই কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বেকারত্ব-সহ সব সমস্যা আজ ভয়ানক রূপ নিয়েছে।

মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি নির্ভর করে দেশের উন্নত পরিকাঠামোর উপর। এত দিন তা হয়নি, এখন হতে পারে। মোদীজীর এই সরকার সেদিকেই নজর দিয়েছে প্রথম থেকে। ফাঁকা জমিতে নতুন বাড়ি তৈরির চেয়ে অপরিকল্পিত, গোজামিল দেওয়া ভাঙাচোরা, ঘুণে খাওয়া জরাজীর্ণ বাড়িকে সুন্দর সুপরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা অনেক বেশি কঠিন। এই দেশটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণপোকার বাসা। সচেতন নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়, রাষ্ট্রের উন্নতি না হলে নাগরিকের দুর্দশা কোনও দিনই ঘুচবে না। তাই আমাদের আগে সুনাগরিক হয়ে উঠতে হবে। তবে সরকারকেও মনে রাখতে হবে, দেশের মানুষ ছোটো ছোটো ব্যক্তিগত স্বার্থ ও চাওয়া-পাওয়ায় যতটা অভ্যস্ত সার্বিক হিতে ততটা নয়। সঙ্গে মানুষের বাস্তব পরিস্থিতি আছে। এখনও দেশের অনেক মানুষ আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে থাকে, রোগে চিকিৎসা না পেয়ে অসহায় ভাবে মরে। খুব সামান্য প্রয়োজনগুলো জুটিয়ে উঠতে পারে না যারা তাদের বৃহত্তর চিন্তার সুযোগ কোথায়। তাই দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এই সকল মানুষের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনটাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। এতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সাযুজ্য থাকাটাও আবশ্যক। তবে মনে রাখতে হবে, দেশের প্রকৃত উন্নতি, নাগরিকের প্রকৃত সেবার উপর এদেশে সরকারের জেতা-হারা নির্ভর করে না। তাৎক্ষণিক ভিক্ষা দিয়ে, জাতপাত আর কোটা করে জনগণকে লোভী স্থায়ী ভিখারি বানিয়ে সামনে টোপ ঝুলিয়ে ভোটবাক্স ভরানোটাই দস্তুর। দেশের উন্নতি করতে গেলে, দেশকে শক্তিশালী করতে গেলে প্রথম শর্ত হলো শক্তিশালী স্থায়ী সরকার। সেটা মোদীজী ও দলকে মনে রেখে কাজ করতে হবে। ▮



স্বস্তিকায় ভালো লাগার কথা খুঁজে পাই

আমি স্বস্তিকার একজন দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ পাঠক। প্রায় গত পঞ্চাশ বছরের। ইদানীং বেশ কিছু বছর আমি স্বস্তিকার প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে পড়ি। কারণ প্রতিটি শব্দের মধ্যে আমি আমার ভালোলাগার কথা খুঁজে পাই। আসলে আমার মনে হয়, আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই স্বস্তিকার পথ চলা। আর সেটাই আমার ভালোলাগার ও ভালোবাসার কারণ। সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে ইদানীং স্বস্তিকার গঠনশৈলীর কিছু পরিবর্তন হওয়ার জন্য আমার ভালোলাগা কয়েক জায়গায় এসে থমকে যায়।

যেমন স্বস্তিকার কয়েকটি পাতা গল্পের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই গল্পগুলো বৈভবশালী ভারতগঠনে কতটা প্রেরণাদায়ী সেটা একটা বিচার্য বিষয়। একই রকমভাবে স্বস্তিকার শেষ পৃষ্ঠার 'রাশিফল' প্রকাশ আমার মতে অতীব মূল্যবান পত্রিকা স্বস্তিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যর সঙ্গে সাযুজ্য নেই, বরং পরিপন্থী। রম্যরচনায় রাহুল গান্ধীর স্কুল ব্যাগ নিয়ে বিমান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া—স্বস্তিকা নামক পত্রিকার অবনমন ঘটায়। কেননা তিনি আদতে কেন্দ্রে প্রধান বিরোধী দলের নেতা। এর পরিবর্তে আমার কাছে কাম্য পুরোনো দিনের সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতা সংগ্রামী বা তাদের কিছু প্রেরণাদায়ী লেখার সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিলে আমাদের ভালো লাগবে।

ভারতবর্ষের অন্য অঙ্গরাজ্যে বর্তমানে সমাজ গঠনে উৎসাহ ব্যঞ্জক কী ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে সেগুলো এই পত্রিকায় প্রকাশ করা যেতে পারে। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলি এবং বহির্বিশ্বের হিন্দু সংগঠনগুলি কী ধরনের অগ্রগতি করছে তার কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করা যেতে পারে। অতীতে বিশ্বের বৃহত্তম অত্যাচার ইহুদিদের বিরুদ্ধে নয়; পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়েছিল তার কিছু প্রামাণ্য আলোকপাত স্বস্তিকার পাতায় দেখলে ভালো লাগবে।

সমাজ পরিবর্তনশীল। তাই স্বস্তিকাতেও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। কিন্তু মূল লক্ষ্য, বৈভবশালী ভারতবর্ষ তৈরি হবে আর তাতে স্বস্তিকারও কিছু সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে স্বস্তিকা কাজ করলে স্বস্তিকার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে তা না হলে আমাদের প্রাণের পত্রিকা বাজারি পত্রিকায় রূপান্তরিত হতে দেরি হবে না।

স্বস্তিকা মানুষের রুচি তৈরি করবে। মানুষের রুচির দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এই আশা নিয়ে আমার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা স্বস্তিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

—স্বপন কুমার নাগ,
শিবপুর, হাওড়া।

ভারত মহাসাগরে চীনা আধিপত্যে ভাঁটা

মালদ্বীপে সাম্রাজ্যবাদী চীনের দাদাগিরি এবং আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন চুরমার হতে বসেছে। কারণ সেদেশের সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছেন চীনপন্থী রাষ্ট্রপতি আবদুল্লা ইয়ামিন। ক্ষমতায় এসেছেন ভারত-বন্ধু নেতা ইব্রাহিম মোহামেদ সালিহ্। জয়ের পরেই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং সালিহের দল এম ডিপি প্রধান মহম্মদ নাসিদ এক বিবৃতিতে বলেছেন, নতুন সরকার চীনের সঙ্গে পূর্বতন সরকারের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনা করে দেখবে। এ কথার অর্থ, চীনের সঙ্গে করা ইয়ামিন সরকারের চুক্তিকে পাঠানো হবে ঠাণ্ডাঘরে। তাঁদের অভিযোগ, মালদ্বীপের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে ইয়ামিনকে ব্যক্তিগত সুবিধা পাইয়ে দিতেই চীন জনবিরোধী চুক্তি করেছিল। দেশবাসী ভোটের বাক্সে তারই জবাব দিয়েছে। অর্থাৎ, চীন বর্তমানে মালদ্বীপে ব্রাত্য।

ওদিকে চীনের আর এক বশংবদ রাজাপাকসেকে গদিচ্যুত করে শ্রীলঙ্কায় সরকারে ফিরেছেন আর এক ভারত-বন্ধু রণিল বিক্রমসিঙ্ঘে। এক্ষেত্রেও চীনের বিদেশ নীতি ধাক্কা খেয়েছে। সত্যি বলতে কী, চীন চেয়েছিল, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কাকে মুঠোয় পুরে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য কায়েম পূর্বক ভারতের বিরুদ্ধে দাদাগিরি চালাতে। কিন্তু ওই দুটি দেশে চীনের তাঁবেদার সরকারের পতনে বেজিংয়ের স্বপ্ন ও উচ্চাশা চুরমার হয়ে গিয়েছে। ফলত দক্ষিণ এশিয়ায় চীন এখন যথেষ্ট কোণঠাসা। তবে পাকিস্তান চীনের কাছে বিক্রি হয়ে গেলেও নেপাল ততটা বিক্রি হয়নি। সেদেশে মাওবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারত কিছুটা ব্যাক্‌ফুটে চলে গেলেও তা সাময়িক। কারণ ধর্ম, সংস্কৃতি, পরম্পরা এবং ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ভারত ও নেপাল মূলত এক। তাই মাওবাদী মোহভঙ্গ ঘটলেই নেপালের জনগণ আবার ভারত-বন্ধু হয়ে উঠবে। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে নেপালের আত্মিক সম্পর্ক অতি প্রাচীন। এ সম্পর্ক অভিন্ন এবং ভেঙে যাওয়ার নয়। যেদিন তারা চীনের আসল মতলব তথা আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারবে সেদিন নেপালে চীন-বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মাওবাদী 'প্রচণ্ড'রা তা সামাল দিতে পারবেন না। তখন চীনও হঠতে বাধ্য হবে নেপাল থেকে। এমনিতেই চীনের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাভাবনা বিশ্ববাসীর অজানা নয়। এই লাল চীন তিব্বতকে গিলেছে, ভারতের আকসাই চীন-সহ অরুণাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। এখন চাইছে পুরো অরুণাচল-সহ দার্জিলিং পর্যন্ত দখল করতে। চীনের মানচিত্রে এমনটাই দেখানো আছে। তাইওয়ান-সহ গোটা ইন্দোচীন এবং নেপালও নজরে আছে। কিন্তু ভারত তার প্রথম বাধা।

তাই সাম্রাজ্যবাদী চীন সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশকে সতর্ক থাকা উচিত।

কারণ চীনের সাম্রাজ্যবাদী শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে এই অঞ্চলের উপরে। তবে এই অঞ্চলে ভারত আজ মহাশক্তিধর দেশ। বিশ্বের অন্যান্য মহাশক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে রয়েছে ভারতের বন্ধুত্ব। তাই চীন ভারতকে ভয় পায়। তার প্রমাণ, অরুণাচল প্রদেশের ডোকালাম থেকে চীনাসেনাদের পিছু হটা। আর এর জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রাপ্য বর্তমান ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকারের। ভাবতে অবাক লাগে, বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে ইতিপূর্বে এদেশের কোনও রাষ্ট্র প্রধানের পা পড়েনি। অথচ বিরোধীদের বহু সমালোচনা সত্ত্বেও একমাত্র নরেন্দ্র মোদীই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিশ্বের প্রায় সব দেশে ভ্রমণ করেছেন। সখ্য স্থাপন করেছেন। তারা জেনেছে— ভারত একটি মহান ধর্ম, সংস্কৃতি এবং শান্তির দেশ। মোদী এখন বিশ্বের জনপ্রিয় রাজনীতিকদের মধ্যে একজন। তিনিই আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা। আর মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কায় চীনপন্থীদের পরাজয় ও ভারত-বন্ধু সরকারের প্রতিষ্ঠা মানে মোদী সরকারের বিদেশনীতিরই জয় বলে মনে করছেন অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

রামমন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের উদাসীনতা কেন?

সেই উনিশের শতক থেকে চলে আসা ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে সব থেকে চর্চিত ঘটনা যার রেশ ভারতীয় উপমহাদেশের আসমুদ্রহিমালয় পর্যন্ত গড়িয়েছে। সেটি অযোধ্যার রামমন্দির ইস্যু। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অনেক ঊর্ধ্বে হিন্দুত্ববাদী আদর্শ। কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে অনির্দিষ্টকালের জন্য রামমন্দিরের রায় বিলম্বিত করার প্রচেষ্টা করছে। আফগানিস্তানের বামিয়ানে তালিবানদের বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দেওয়ার মতো 'হিন্দু তালিবান' দ্বারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে--- সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবীর এহেন মন্তব্য যে শুধু হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করেছে নয়, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকেও আঘাত করেছে। শীর্ষ আদালত অযোধ্যা বিতর্ককে শুধুমাত্র ভূমি বিরোধ বলে উল্লেখ করেছে।

রামমন্দিরের সমস্যা অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই কোর্টকে দ্রুত তার সমাধান করতে হবে। গত ৩০ বছর ধরে আন্দোলন চলছে এবং হিন্দুদের অপেক্ষাটি শেষ হচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে। চূড়ান্ত রামমন্দির রায়ের অনির্দিষ্ট বিলম্ব নিশ্চিত করার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনেক বেশি। কংগ্রেস ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রামমন্দিরের শুনানি হোক চায় না। কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল রামমন্দির শুনানির স্থগিতাদেশের জন্য বেঞ্চের কাছে সরাসরি একটি অনুরোধ দাখিল করেছেন।

মহামান্য আদালতের যে চরম উদাসীনতা গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে কার্যত স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে এর একমাত্র কারণ হলো মুসলমান তোষণ। আর কতদিন কোটি কোটি হিন্দুভাই-বোনদের এই প্রহসনের শিকার হতে হবে? দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বলতেই হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট তার মর্যাদা, ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ বলেছেন, 'দেশের হিন্দুরা তাদের ধৈর্যের সীমা হারাচ্ছে। আমি ভীত হব যদি হিন্দুরা তাদের ধৈর্য হারায় তাহলে কী হবে।' শ্রীরাম হিন্দুদের বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর। এই বিশ্বাসের গোড়ায় দীর্ঘকালীন যে আঘাত তারা পাচ্ছে তা যদি দ্রুত শেষ না হয় তার প্রভাব বা ফলাফল কোনওটাই যে খুব সুখকর হবে না তা অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহ অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। ভারতবর্ষে উপাসনা করার মৌলিক অধিকার প্রত্যেকের আছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে বর্তমান পরিস্থিতি এতটাই জটিল থেকে জটিলতার হচ্ছে সেই মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। এবং অত্যন্ত শৌখিন ভাবে বর্তমানে তা লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

রামভক্তদের একটাই বক্তব্য— কেন্দ্রে মোদী ও রাজ্যে যোগী থাকা সত্ত্বেও কেন মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করা গেল না। শীর্ষ আদালত গড়িমসি করলে অর্ডিন্যান্স জারি করে রামমন্দির নির্মাণের দাবি করেছেন তারা। দীর্ঘকালীন আইনি জটিলতার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবে যে মন্দির নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক তা বুঝেই এই 'অনির্দিষ্টকালীন বিলম্ব' আরও দৃঢ়ে পরিণত হয়েছে। একটি পবিত্র স্থানের উপর চলমান, অমীমাংসিত আইনি জটিলতা সময়ের সঙ্গে খারাপ হচ্ছে। অযোধ্যাতে এটি মারাত্মক ভাবে খারাপ হয়ে দেখা দিচ্ছে। আদালতের এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান যে লোপ পাচ্ছে তা বোঝা যায়।

আজ এই চরম সংকটের সময়ে হিন্দুদের এক হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের শাশ্বত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর সুপ্রিম কোর্টের বিলম্ব প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায়, মন্দির নির্মাণ নিয়ে যে দোলাচল চলছে তা বন্ধ হোক। বিচারকদের কাছে আবেদন যে, সময় এমনিতেই শেষ হয়ে গেছে, আর শুনানির স্থগিতাদেশ দিয়ে হিন্দুদের উপর অন্যায় করবেন না। কোনও রকম রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে চির শাশ্বত চির সত্যের পথে চির সনাতন অধিকারকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে এসে যত দ্রুত সম্ভব এই মামলার নিষ্পত্তি করুন।

—রনিতা সরকার,
চুঁচুড়া, হুগলী।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

তিন রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গড়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপদ আরও বাড়ল

অমিতাভ মিত্র

বড় বিপদ! দিদির সামনে বড় বিপদ। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল দিদিকে এত বড়ো বিপদের মুখে ফেলবে দিদি স্বপ্নেও তা ভাবতে পারেননি। ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে সুদীপ্ত সেন ও গৌতম কুণ্ডুকে মাঝরাতে দার্জিলিংয়ের ডেলোর বাংলোয় গোপন বৈঠকে বলেছিলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। সুতরাং তোমরা আমাকে চিটফান্ডের লুণ্ঠিত অর্থ দাও, প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাংলা, বিহার, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের মানুষকে লুঠতে সাহায্য করবো। দিদি তদানীন্তন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মুকুল রায়কে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথাটা বেশ কয়েকটা জনসভায় বলিয়েছিলেন। কিন্তু দিদির সেই আশায় একেবারে জল ঢেলে দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪ সালে লোকসভায় ৩০ বছর পর একমাত্র বিজেপি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ম্যাজিক ফিগার ২৭২ অতিক্রান্ত করে এনডিএ সরকার গঠন করে। তারপর মমতা দিদি প্রায় ছ'মাস বাকরুদ্ধ, ভাবলেশহীন ভাবে কাটিয়েছেন। সাধের ৩৪টি লোকসভার আসন তাঁর হোমেও লাগেনি, যজ্ঞেও লাগেনি। দুঃখে কষ্টে মাঝে মাঝে নাখোদা মসজিদের ইমামকে নিয়ে মিটিং করেছেন।

যাইহোক, ধীরে ধীরে পার্থ-শোভন-ববিদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয়। সিপিএমের বিমান-সূর্যের কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শোনে না। গান্ধী পরিবারের কংগ্রেসকে দিদি প্রায় গিলে ফেলেছেন। সুতরাং এখানে বিরোধী শক্তি বলতে বিজেপি। ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম-কংগ্রেসের জোট পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আকাশ থেকে ফেলেছে। ফলস্বরূপ মমতা তথা তৃণমূল বিরোধী শক্তি হিসেবে এই দুই পার্টিকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে কফিনের শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছেন রাজ্যের মানুষ। বর্তমানে রাজ্যে বিরোধী শক্তি বলতে বিজেপি। ২০১৩ বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রতিটি বিধানসভা ও লোকসভা উপনির্বাচনে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি দু'নম্বরে উঠে এসেছে। বিজেপি কর্মীদের খুন করছে তৃণমূল হার্মাদরা তথা দিদির ভাইয়েরা। বিজেপি রাজ্য সভাপতি-সহ বিভিন্ন নেতাদের উপর প্রকাশ্যে, পুলিশের সামনে চলছে আক্রমণ।



যা পাওয়ার কংগ্রেস পেয়েছে, যা হারানোর বিজেপি হারিয়েছে। আপনি পেলেন কী? সিঙ্গাপুরী কলা না ইতালির লেদার ব্যাগ?

কিন্তু কেন বিজেপি ও মোদী-শাহ জুটিকে প্রতিদিন আক্রমণ? কারণ তৃণমূল বিরোধী পরিসর প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিজেপি দখল করে চলেছে। করছে। তাই বিজেপি, মোদী-শাহকে গালি না দিয়ে দিদি এক ঢোক জলও খান না। তাঁকে আবার রাজ্যের মানুষকে টুপি পরিয়ে বাংলার ৪২টি লোকসভার মধ্যে সর্বাধিক আসন জয়লাভ করে আগামী ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে হবে। সুতরাং মানুষকে স্টার্নিং কিছু বলতে হবে। তিনি ভারতের প্রথম বাঙ্গালি প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পার্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে! সুতরাং রাজ্যের মানুষের তাঁকে ভোট দিতে হবে। ৪২শে ৪২টি লোকসভা আসনই করতে হবে। যেটা ২০১৪ সালে গুজরাটে মোদীজী করেছিলেন, ২৬শে ২৬টি লোকসভা আসন। 'চাঁদের সঙ্গে কার তুলনা'!

যাইহোক, দিদিকে এবার ইউনিক কিছু

করতে হবে। দিদি মুড়ি-তেলেভাজা ঝোলা নিয়ে সারা ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। আজ দিল্লি তো কাল চেন্নাই, পরশু পাটনা তো তরশু বেঙ্গালুরু। মিডিয়ার সামনে ফটোসেশন শুরু হয়ে গেল। কখনও মায়া-অখিলেশের পাশে, কখনও নাইডু-কুমারস্বামী আবার কখনও আবদুল্লা বাপ-ব্যাটা বা গান্ধী মা-ছেলের সঙ্গে।

ব্যস, পিকচার হিট। ২০১৯শে দিদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর ভাইপো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মা-মাটি-মানুষের জয় হয়ে গেল!

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সারদা-নারদা, সিন্ডিকেট, বেকারত্ব সব ইস্যু ভুলে মমতা, মমতা নাম জপ করবে। ভারতের প্রথম বাঙ্গালি প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের প্রথম 'কচি' মুখ্যমন্ত্রী— দুটোই দিদি তথা তৃণমূলের রাজ্যের মানুষকে উপহার! কিন্তু দিদি, পিকচার আভি বাকি হ্যায়! দিল্লি বহোত দূর! আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন যে আপনি একটা আঞ্চলিক দলের মুখ্যমন্ত্রী। নামে তালপুকুর অথচ ঘটি ডোবে না। নামেই অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই। ২০১৪ সালে 'মোদীঝড়ে' যতই কংগ্রেস লোকসভায় ৪০-৪২টি আসন পেয়ে লোকসভায় বিরোধী দলনেতার আসন না পাক, তবুও বিজেপির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। এখনও ভারতের ২৯ রাজ্যের বেশি রাজ্যে বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ। আপনার চালাকি কতদিন চলবে? ১১ নভেম্বর পাঁচ রাজ্যের ফলাফলের দিনেই আপনার সব ফানুস ফুটো হয়ে গেল। দু'দিন আগেই দিল্লিতে গিয়ে একেবারে উত্তরের শীতের মতো জাঁকিয়ে বসেছিলেন। কংগ্রেস বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত হবে। আর সব জোট-ঘোটের নেতারা ওনার পদসেবা করবেন। ব্যাস্, দিদি রানি থেকে মহারানির আসনে সমাদৃত হবেন। কিন্তু দিদি 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে', পাঁচ রাজ্যের মধ্যে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের জেতারই ছিল, আর বিজেপির হারারই ছিল। তবে, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে বিজেপির এত বেশি আসন পাওয়ার কথা ছিল না। যাইহোক, যা পাওয়ার কংগ্রেস পেয়েছে, যা হারানোর বিজেপি হারিয়েছে। আপনি পেলেন কী? সিঙ্গাপুরী কলা না ইতালির লেদার ব্যাগ? আপনাকে তো কলকাতায় খালি হাতে ফিরতে হলো। কলকাতায় ফিরে রাজ্যের মানুষকে কী বললেন। আপনারা আমায় ৪২শে ৪২ করুন, আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নয়, একেবারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হব, কারণ ডোনাল্ড ট্রামকে 'আমেরিকার হাউস' ইমপিচমেন্ট করবে!

আসলে আপনি রাজ্যের মানুষকে গোরু-ছাগল ভাবেন। তাদের সরল সাদা-সিধে আবেগ নিয়ে খেলা করেন। তাদের বিশ্বাস নিয়ে আপনি ব্যবসা করেন। আপনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের রক্ত চুষে কালিঘাটের 'বন্দ্যোপাধ্যায় এন্টারপ্রাইজ' দাঁড় করিয়েছেন। আপনার মুনাফা বৃদ্ধি অম্বানি, মিত্তালদেরও হার মানায়। যারা প্রকৃত আপনাকে চেনে তারা জানে আপনি কী জিনিস! ওই নীল পেড়ে সাদাশাড়ি আর হাওয়াই চটির রহস্য কী! শুধু ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষ্যে কলকাতা, দিল্লির পাঁচতারা হোটেলের পার্টি যারা দেখার সুযোগ পেয়েছে, তারা দেখেছে আপনার ঐশ্বর্য, বিলাসিতা।

প্রকৃতপক্ষে, আপনি ভেবেছিলেন এবারও বোধহয় মোদী-শাহ জুটি রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় ধরে রাখবেন। কংগ্রেস খরচের খাতায় চলে যাবে, আর আপনার কেল্লাফতে হয়ে যাবে। গত ৩৩ বছর ধরে রাজস্থানে কংগ্রেস ও বিজেপি পাঁচ বছর অন্তর সরকার পাল্টায়। শুধুমাত্র ২০১৩ সালে বিজেপি ভালো কাজের জন্য টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসে। সুতরাং এবার তো হারবারই ছিল। তাও যে ১৯৯ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় বিজেপি ৭৩টি আসন পেয়েছে, এটাই তো বড়ো কথা। অপরপক্ষে মধ্যপ্রদেশে টানা পনেরো বছরের সরকার। তাও বিজেপি, ১০৯টি আসন পেয়ে ম্যাজিক ফিগার থেকে সামান্য দূরে থেকে গেছে। ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস অনেক মিথ্যে কথা বলে বিজেপির ১৫ বছরের সরকারকে হটিয়েছে।

বড়ো কিছু পাওয়ার আগে ছোটো কিছু হারানো ভালো। ৬ মাস পরের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে আবারও সাবধানের সঙ্গে আপামর ভারতের সকলস্তরের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে, নির্বাচনী ইস্তেহার রচনা করে পরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকার গড়তে হবে।

মমতা দিদি, মুকেশ অম্বানির মেয়ের বিয়ে খেয়ে কি নতুন কোনও গিমিক মাথায় আসবে? আসবে না, আপনাকে আবার সেই বঙ্গ-বিজেপির সামনে দাঁড়াতে হবে। যারা কিনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। 'রথের' চাকা কি আপনি আটকাতে পারবেন? অতীতে লালু, মুলায়ম রথের চাকা আটকাতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের কী হাল হয়েছিল আপনি জানেন। লালু জেলে আর মুলায়মকে তাঁর ছেলে অখিলেশ সাম্রাজ্যচ্যুত করেছে। আর জে ডি এবং স পা তাদের রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত। এটা বিজেপির রথ! সিপিএমের 'জাঠা' নয়। সুতরাং খুব সাবধান! আপনার চোর-ডাকাত ভাইয়েরা কিন্তু কোনও কাজ করতে পারে না। শুধুমাত্র আপনার তাঁবেদারি করা ছাড়া!

কোমর ভাঙা সি পি এম আর 'সাইনবোর্ড'সর্বস্ব রাজ্যের কংগ্রেস আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। তাতে সিপিএম যতই চাষিদের নিয়ে সিঙ্গুর আন্দোলন করুক আর রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ভাঙা হাটে কংগ্রেসের অধীর-সোমেন-মান্নান-দীপা হাত ধরে দাঁড়াক। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আপনাকে হঠাতে যা করার বিজেপিকেই করতে হবে এবং বিজেপি তা করবে, তাতে আপনি যতই অক্সিজেন দিয়ে সিপিএম-কংগ্রেসকে বাঁচাতে চেষ্টা করে নিজের জীবন-জীবিকা-অবলম্বন ঠিক রাখতে চান। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার, ১২টি রাজ্যে বিজেপি সরকার এবং ৬টি রাজ্যে বিজেপির শরিকদের সরকার। যদিও রাহুল গান্ধী হালে একটু পানি পেলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আপনার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে না তো!

ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হবে বিজেপি

চন্দ্রভানু ঘোষাল

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। ভিডিয়োটিতে কংগ্রেস নেতা কমলনাথ মুসলমান ভোটারদের আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা যদি সবাই ভোট না দেন তাহলে আমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হব।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'অতীতের দিকে তাকান। ইন্টারনেট ঘাঁটলেই দেখতে পারেন, মুসলমান-প্রধান বুথগুলোতে ৫০-৬০ শতাংশের বেশি ভোট আজ অবধি কখনও পড়েনি। আমার প্রশ্ন ৬০ শতাংশ যদি পড়তে পারে তাহলে পুরো একশো শতাংশ নয় কেন? এবার আমাদের একশো শতাংশ মুসলমান ভোট দরকার।' বলাবাহুল্য, কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি। বিজেপি নির্বাচন কমিশনের কাছে 'কংগ্রেস মেরুকরণের রাজনীতি করছে' বলে অভিযোগ করলেও নেতাদের একাংশ ভেবেছিলেন এই ভিডিয়োর ফলে হিন্দুভোট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজোট হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এক জোট হয়েছে মুসলমান ভোট। কংগ্রেসকে যা নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে সাহায্য করেছে।

বস্তুত এবার হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের অন্যতম মুখ্য করিগর মুসলমান এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের একাংশ। ভোটের আগে ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস এবং মাওবাদীদের মধ্যে গোপন আঁতাতের অভিযোগ করেছিল বিজেপি। সেই অভিযোগ যে নেহাত ঠুনকো ছিল না তার প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া গেছে। সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করেছে আরবান নকশালরা। যার রেশ এসে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। কয়েকমাস আগে শ্রীরামপুরে আয়োজিত নকশালপন্থী মানবাধিকার সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অব ডেমোক্র্যাটিক রাইটসের (এ পি ডি আর) একটি সেমিনারের শিরোনাম ছিল, 'রাষ্ট্র তার সন্তানদের হত্যা করতে পারে না।' এখানে 'সন্তান' অর্থে ইসলামি জঙ্গি। এই ধরনের কথা আমরা প্রায়ই রাহুল গান্ধীর মুখে শুনে থাকি। আফজল গুরুর স্মরণে জে এন ইউ-তে যে শোকসভা হয়েছিল সেখানে রাহুল গান্ধী সীতারাম ইয়েচুরিদের উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। অভিযোগ, এবারের নির্বাচনে মাওবাদীরা তো বটেই বামপন্থী দলগুলোও কংগ্রেসকে সাহায্য করেছে। সারা দেশে কৃষক অসন্তোষ এই আঁতাতের ফসল। এবং এটাও অনস্বীকার্য, এবারের নির্বাচনে কৃষক অসন্তোষ একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে।

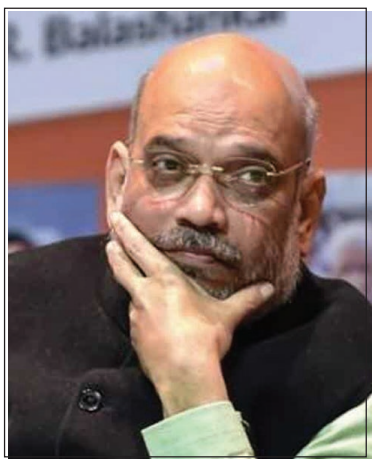

পাঁচ রাজ্যে বিজেপির ফলাফল ভালো হয়নি বলে যারা ভাবছেন উনিশের সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী হেরে যাবেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী এখনও দেশের মানুষের প্রথম পছন্দ এবং নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর জন্য শপথও নেবেন।

হিন্দি বলয়ে তিন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে প্রধান ইস্যু ছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে বিজেপি পনেরো বছর ক্ষমতায় আছে। অন্যদিকে রাজস্থানে আছে পাঁচ বছর। আরও দুটি বিষয় মধ্যপ্রদেশে বিজেপির বিরুদ্ধে গেছে। (১) টিকিট বণ্টন নিয়ে জটিলতা। একটা সময়ে টিকিট বণ্টন নিয়ে বিজেপির অন্তর্কলহ তুঙ্গে পৌঁছেছিল এবং যাঁরা টিকিট পাননি তাঁরা প্রকাশ্যেই অনেকে শীর্ষ নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলেন। এত কিছুর পরেও প্রার্থী বাছাই নিখুঁত হয়নি। এমন অনেকে টিকিট পেয়েছেন যাঁদের সেই অর্থে যোগ্যতা নেই। (২) ঠিক ভোটের মুখে মূলত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর উস্কানিতে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভ এবং বুন্দেলখণ্ড ও চম্বলে সংরক্ষণ বিরোধী সভাসমাবেশ।

এর ফল অবশ্যই ভালো হয়নি। ২০১৩ সালে মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৪.৯ শতাংশ ভোট। আসন পেয়েছিল ১৬৫টি। ২০১৮ সালে বিজেপির ভোট কমে হয়েছে ৪১.৩ শতাংশ। আসন ১০৯টি। অন্যদিকে কংগ্রেস ২০১৩ সালে পেয়েছিল ৩৬.৪ শতাংশ ভোট। এবার সেই ভোট বেড়ে হয়েছে ৪১.৪ শতাংশ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের হিসেবে বিজেপি এবং কংগ্রেস প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তার জন্য দায়ী মূলত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, বিজেপির সংগঠনিক বিশৃঙ্খলা এবং কংগ্রেসের জনমোহিনী রাজনীতি। কৃষক অসন্তোষের আবহে কৃষিঋণ মকুব করার ঘোষণা জনমোহিনী রাজনীতির পর্যায়েই পড়ে। সেই সঙ্গে রয়েছে শহুরে ভোটারদের মন পাওয়ার জন্য ইলেকট্রিক বিলে ৫০ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা। এসব কংগ্রেস কতটা করতে পারবে তারাই জানে, কিন্তু যেন-তেন-প্রকারে ক্ষমতা

দখলের জন্য এই টোটকা যে কার্যকরী হয়েছে তাতে সন্দেহ করা চলে না। ফলত আমরা দেখছি মহাকৌশল অঞ্চলে (মোট আসন ৪৩টি) বিজেপির আসন ২৯ (২০১৩) থেকে কমে হয়েছে ১৪টি। সেখানে কংগ্রেসের ১৩ (২০১৩) থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮টি। মালওয়া/ নিমার অঞ্চলে (মোট আসন ৬৬টি) বিজেপির আসন ৫৬ (২০১৩) থেকে কমে হয়েছে ২৯টি। কংগ্রেসের ৯ (২০১৩) থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৪টি। গোয়ালিয়র-চম্বল অঞ্চলে বিজেপি ২০১৩ সালে পেয়েছিল ২০টি আসন। এবার ৭টি। ২০১৩-তে কংগ্রেস পেয়েছিল ১২টি আসন। এবার পেয়েছে ২৬টি। মধ্য ভারতেও (মোট আসন ৩১টি) বিজেপির আসন কমেছে। ২০১৩-তে পেয়েছিল ২৪টি। এবার পেয়েছে ৯টি আসন। একমাত্র বুন্দেলখণ্ড/বাঘেলখণ্ড অঞ্চলে বিজেপির আসন সামান্য হলেও বেড়েছে। ২০১৩-তে পেয়েছিল ৩৬টি আসন, এবার পেয়েছে ৩৮টি। মধ্যপ্রদেশের মোট জনজাতি ভোটের ৪৩ শতাংশ এবার গেছে কংগ্রেসের ঝুলিতে। তপশিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে ৫৩ শতাংশ কেন্দ্রে বিজয়ী হয়েছে কংগ্রেস।

রাজস্থানের ছবিটা একটু আলাদা। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে প্রাথমিক ভাবে এগিয়ে থেকেও বিজেপি জিততে পারেনি। কিন্তু রাজস্থানে তারা ভোটের অনেক আগে থেকেই পিছিয়ে ছিল। এর প্রধান কারণ বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া এবং তাঁর মন্ত্রীদের অহংকার, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব এবং নীচুতলার কর্মী ও রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে দূরত্ব। যার প্রভাব ভোটের ফলাফলে পড়েছে। ২০১৩ সালে বিজেপি পেয়েছিল ৪৫.৫ শতাংশ ভোট। এবার পেয়েছে ৩৮.৮ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৩-তে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩৩.৩ শতাংশ ভোট। এবার পেয়েছে ৩৯.৩ শতাংশ। রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (মোট আসন ৩৫টি) ২০১৩ সালে বিজেপি পেয়েছিল ২৮টি আসন। এবার পেয়েছে ১০টি। ২০১৩ সালে এখানে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩টি আসন। এবার পেয়েছে ২০টি। দক্ষিণ-পূর্বে (মোট আসন ৪৪টি) ২০১৩ সালে বিজেপি পেয়েছিল ৪১টি আসন। এবার পেয়েছে ২২টি। কংগ্রেস ২০১৩ সালে পেয়েছিল ৩টি আসন। এবার পেয়েছে ২০টি। দক্ষিণ পশ্চিমে (মোট আসন ৩৭টি) ২০১৩ সালে বিজেপি পেয়েছিল ৩৩টি আসন। এবার পেয়েছে ২১টি। কংগ্রেস ২০১৩ সালে পেয়েছিল ৩টি আসন। এবার পেয়েছে ১২টি। উত্তর-পূর্বে (মোট আসন ৮৪টি) ২০১৩ সালে বিজেপি পেয়েছিল ৬১টি আসন। এবার পেয়েছে ২০টি। কংগ্রেস ২০১৩ সালে পেয়েছিল ৩টি আসন। এবার পেয়েছে ৪৭টি। গ্রামে বসবাসকারী ৩৮ শতাংশ ভোটার এবার কংগ্রেসের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেছেন। সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা কৃষক অসন্তোষ বিজেপির কতটা ক্ষতি করেছে এই তথ্য তার প্রমাণ। শহরের ছবিটা অবশ্য অন্যরকম। সেখানে দুই দলই ৪১ শতাংশ করে ভোট পেয়েছে।

একথা ঠিক, রাজস্থানে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদল হয়। সেই হিসেবে এই ফলাফল হয়তো প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের মাত্র চার মাস আগে রাজস্থান রাজ্যে বিজেপির কাছ থেকে যে-ইতিবাচক মনোভাব আশা করেছিলেন সকলে, সেটা পাওয়া যায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের উন্নাসিকতা এবং গয়ংগচ্ছ মানসিকতার জন্য।

বিজেপি সম্ভবত সব থেকে বড়ো ধাক্কা খেয়েছে ছত্তিশগড়ে। প্রায় প্রতিটি এক্সিট পোলে বিজেপিকে এগিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মিডিয়ার বিশ্লেষণে যে কারণ উঠে এসেছে তা মোটামুটি এইরকম : আমলাদের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, কয়েকজন মন্ত্রীর ঔদ্ধত্য, নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে স্পষ্ট করে কোনও প্রতিশ্রুতি না দেওয়া, রাহুল গান্ধীর ঋণমকুব প্রস্তাবের পাল্টা কিছু না বলা এবং নীচুতলার কর্মীদের নিষ্ক্রিয়তা। বিজেপির সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন অজিত যোগী। সকলে ধরে নিয়েছিলেন অজিত যোগীর জনতা কংগ্রেস (যোগী) কংগ্রেসের ভোট কাটবে কিন্তু হয়েছে তার উল্টো। এবার (২০১৮) বিজেপি মাত্র ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অথচ ২০১৩ সালে পেয়েছিল ৪১.২ শতাংশ। অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছে ৪৩.১ শতাংশ ভোট। ২০১৩ সালে পেয়েছিল ৪০.৪ শতাংশ। ছত্তিশগড়ের শহরাঞ্চলে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৪০.১ শতাংশ, কংগ্রেসের ৪৬ শতাংশ। রাজ্যের মধ্যবর্তী সমতল অঞ্চলে ২০১৩ সালে বিজেপি পেয়েছিল ৪১টি আসন, এবার পেয়েছে ১৪টি। অন্যদিকে কংগ্রেসের আসন ২৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৩টি। সরগুজা-যাশপুর মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা। এখানে ২০১৩ সালে বিজেপি ৪টি আসন পেয়েছিল, এবার কোনও আসন পায়নি। অন্যদিকে কংগ্রেসের আসন ৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪টি। বাস্তার অঞ্চলেও একই ছবি। এটিও মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকা। গতবার এখানে বিজেপি ৪টি আসন পেয়েছিল, এবার পেয়েছে ১টি। কংগ্রেসের আসন ৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১টি। এই লেখার শুরুতেই কংগ্রেসের সঙ্গে মাওবাদীদের আঁতাতের কথা বলেছি। গত কয়েক বছরের মতো এবারও সেই গোপন আঁতাতের ছাপ পড়েছে ভোটের ফলাফলে। অন্য বামপন্থী দলগুলো ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেলেও ঝুলি ভরেছে কংগ্রেসের।

বিজেপির দৃষ্টিকোণ থেকে তো বটেই, সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেও এই ফলাফল যথেষ্ট হতাশাজনক। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন তা সম্পূর্ণ করার জন্য ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আরও শক্তিশালী হয়ে ফেরা প্রয়োজন। অথচ হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হলেন। বিজেপির এখন নিবিড় আত্মসমীক্ষা প্রয়োজন। এমন কিছুই করা যাবে না যা তাদের রাজনৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। বিজেপি ধর্মনিরপেক্ষ দল নয়, হিন্দুত্ববাদী দল। সুতরাং রামমন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গটি আদালতের ওপর ছেড়ে না দিয়ে সংসদের চলতি অধিবেশনেই অর্ডিন্যান্স জারি করা দরকার। অয়োধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলে মানুষ কিন্তু ক্ষমা করবে না।

সব শেষে একটি কথা। পাঁচ রাজ্যে বিজেপির ফলাফল ভালো হয়নি বলে যারা ভাবছেন উনিশের সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী হেরে যাবেন তারা কিন্তু মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী এখনও দেশের মানুষের প্রথম পছন্দ। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিজেপি আরও শক্তিশালী হবে। এবং নরেন্দ্র মোদীও দ্বিতীয়বারের জন্য শপথ নেবেন। ■

তিন রাজ্যের ফলাফল বিজেপির সামনে আত্মসমালোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে



রন্তিদেব সেনগুপ্ত

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ফল আশাব্যঞ্জক হয়নি। বরং, বলা যেতে পারে, এই পাঁচ রাজ্যের ভিতর যে তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ফল হতাশ করেছে গেরুয়া পরিবারকে, সেই তিন রাজ্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতৃত্বকে একটু চিন্তাতেই রাখবে। সেই সঙ্গে আত্মসমালোচনার একটি সুযোগও এনে দেবে। বিভিন্ন মহল থেকে এবার দাবি করা হচ্ছিল— হিন্দি বলয়ের গুরুত্বপূর্ণ এই তিন রাজ্যের নির্বাচন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে একটি সেমিফাইনাল। এই তিন রাজ্যের নির্বাচনে যে ভালো ফল করবে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সে মানসিকভাবে এবং সাংগঠনিকভাবেও অনেকখানি এগিয়ে থাকবে। একথাও অস্বীকার করে লাভ নেই— এই নির্বাচনের ফলাফল রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে এবং বিজেপি বিরোধীদের ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে। বিশেষত কংগ্রেসকে অনেকটাই মানসিকভাবে চাঙ্গা করেছে। নির্বাচনের এই ফলাফলে বেশি যদি কেউ লাভবান হয়ে থাকেন— তিনি কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। দলে তো বটেই, এমনকী বিরোধী জোটেও এর ফলে তাঁর নেতৃত্ব

কার কত আসন	২০১৩	২০১৮
মধ্যপ্রদেশ (২৩০)		
বি জে পি	১৬৫	১০৯
কংগ্রেস	৫৮	১১৪
বি এস পি	৪	২
অন্যান্য	৩	৫
রাজস্থান (১৯৯)		
বি জে পি	১৬৩	৭৩
কংগ্রেস	২১	৯৯
বি এস পি	৩	৬
অন্যান্য	১৩	২১
ছত্তিশগড় (৯০)		
বি জে পি	৪৯	১৫
কংগ্রেস	৩৯	৬৮
বি এস পি	১	২
অন্যান্য	১	৫

অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত হবে। অখিলেশ, মায়াবতী, চন্দ্রবাবু বা মমতার সঙ্গে দরকষাকষিতে তিনি অনেক সুবিধাজনক জায়গায় থাকবেন। ইতিমধ্যেই রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের ফলাফল উল্লেখ করে বিরোধী শিবির বলতে শুরু করেছে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তারা বিজেপিকে বিদায় করেই ছাড়বে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সমস্যা হলো— নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত কে জিতলো সেটাই বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। চুলচেরা বিশ্লেষণটি হয়ে পড়ে গৌণ। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে বিজেপির পরাজয়টাই প্রধান হয়ে পড়েছে। হারজিতের চুলচেরা কোনও বিশ্লেষণ হচ্ছে না।

বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে পাঁচটি রাজ্যে— তেলেঙ্গানা, মিজোরাম, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়। বিজয় উল্লাসের ভিতর বিরোধী শিবির একবারও উচ্চারণ করছে না যে, এই পাঁচটির মধ্যে দুটি রাজ্যে— তেলাঙ্গানা ও মিজোরামে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। তদুপরি, তেলেঙ্গানায় বিরোধী জোটের অন্যতম হোতা চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশমেরও শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। তেলেঙ্গানায় রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস এবং চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম জোট বেঁধে লড়তে নেমেছিল চন্দ্রশেখর রাওয়ের তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস এবং তেলুগু দেশমের জোট চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে। বলতে গেলে চন্দ্রশেখর রাওয়ের তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের সামনে তারা উড়ে গিয়েছে। মিজোরামে কংগ্রেসের লড়াইটা ছিল এম এন এফের সঙ্গে। এখানে লালথানহাওলার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে নিঃস্ব করে দিয়েছে এম এন এফ। পাঁচ পাঁচবারের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী লালথানহাওলাকে এবার এম এন এফের কাছে বিদায় নিতে হয়েছে। বিরোধীরা তাদের

বিজয়োৎসবের মাঝে ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করছে না যে, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামে রাহুল গান্ধীর কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। এই দুই রাজ্যে বিজেপির তেমন শক্তি ছিল না। বলতে গেলে প্রায় শূন্য থেকেই বিজেপি এই দুই রাজ্যে লড়তে নেমেছিল। কাজেই তেলেঙ্গানায় বা মিজোরামে বিজেপি নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করবে— এমন উন্মাদের স্বপ্ন বিজেপি নেতৃত্বও দেখেননি। ফলে হারজিতের প্রশ্নও সেভাবে ওঠে না। তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামে যে কটি আসন পেয়েছে সেটিই লাভ বিজেপির। একেবারেই কিছু না থাকার চেয়ে কিছু থাকার জায়গায় এই দুই রাজ্যেই পৌঁছেছে বিজেপি।

বাকি রইল রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়। একথা অনস্বীকার্য জাতীয় রাজনীতিতে এই তিন রাজ্যের যথেষ্টই গুরুত্ব রয়েছে। তেলেঙ্গানা বা মিজোরামের সঙ্গে এদের একাসনে বসানো যায় না। এই তিনটি রাজ্যেই বিজেপি ক্ষমতায় ছিল। এর ভিতর মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে বিজেপি গত পনেরো বছর যাবৎ ক্ষমতায় ছিল। এবার নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশে, বলতে গেলে, কান ঘেঁষে জিতে কংগ্রেস সরকার গড়ছে। রাজস্থানেও কংগ্রেস সরকার গড়ছে, তবে ফারাকটা সেখানেও বেশি নয়। সত্যি যদি বিজেপি পর্যুদস্ত হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে ছত্তিশগড়ে। হিন্দি বলয়ের এই তিন রাজ্যে বিজেপির পরাজয়কেই বিরোধী শিবির ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ভরাডুবি বলে প্রচার করছে। কিন্তু যতটা ভরাডুবি বলা হচ্ছে, সত্যই কি ততটা হয়েছে? ভোটের হিসাব কী চিত্র দেখাচ্ছে একবার দেখে নেওয়া যাক। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের মোট প্রাপ্ত ভোট ১,১৬,৬১,৫৬১। বিজেপির প্রাপ্ত মোট ভোট ১,১৬,৫০,৭৫১। অর্থাৎ ব্যবধান মাত্র ১০,৮১০টি ভোটের। এই রাজ্য নোটায় ভোট পড়ছে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার। মধ্যপ্রদেশেই ৩৪টি আসনে বিজেপি ৩০০ অথবা তারও কম ভোটে হেরেছে। ৬টি আসনে হেরেছে ১০ অথবা তার কম ভোটে। দুটো আসনে হেরেছে ঠিক এক ভোটে। এই হিসেবই বলে দিচ্ছে পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার পর, প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশ থেকে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। কংগ্রেস সরকার গড়লেও বিজেপির অবস্থানটি এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী। আসা যাক রাজস্থানের কথায়। রাজস্থানের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজেকে নিয়ে বিজেপির ভিতরেই যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। বসুন্ধরা সম্বন্ধে এই ক্ষোভের আঁচ বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এবার নির্বাচনের আগেই শোনা যাচ্ছিল বসুন্ধরার কারণে বিজেপি রাজস্থানে হারবে। তদুপরি, রাজস্থানে পাঁচ বছর পর পর সরকার বদলের একটি ট্রাডিশন হয়েছে। এই সব প্রতিকূলতার ভিতর দিয়েই রাজস্থানে বিজেপিকে লড়তে হয়েছে। রাজস্থানে কংগ্রেসের প্রাপ্ত মোট ভোট ১,২৯,৮৯,০৫৩। বিজেপির প্রাপ্ত মোট ভোট ১,২৮,৩৪,১৯০। ব্যবধান মাত্র ১,৫৫,৮৬২টি ভোটের। এখানে নোটাতে ভোট পড়েছে ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার। ভোটের এই হিসাব এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে ব্যবধানই বলে দিচ্ছে, বিরোধীরা যতটা প্রচার করছে, সেই বিপর্যয় বিজেপির ঘটেনি। ক্ষমতা হারিয়েও বিজেপি কিন্তু এখনও এই দুই রাজ্যেই যথেষ্ট শক্তিশালীই রয়ে গিয়েছে। যেটা লক্ষ্য করার মতো তা হলো— এই দুই রাজ্যেই নোটাতে প্রভূত পরিমাণে ভোট পড়েছে। নোটাতে এই ভোট কারা দিয়েছে? একটু তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে— নোটাতে তারাই ভোট দিয়েছে, যারা কংগ্রেসের সুবিধা করতে চায়নি, অথচ বিজেপিকেও একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছে। এরা যদি বিজেপিকে হারিয়ে কংগ্রেসকেই ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চাইতো তাহলে ভোটটা কংগ্রেসকেই দিত। এতেই বোঝা যায় এদের উদ্দেশ্য কংগ্রেসকে জেতানো ছিল না। এদের উদ্দেশ্য ছিল বিজেপিকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া। কারা এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিল? বোঝাই যায়, বিজেপির সমর্থক যে ভোটররা রয়েছে, তাদের একটি বড়ো বিক্ষুব্ধ অংশ নোটাতে ভোট দিয়ে বিজেপিকে এই শিক্ষাটি দিতে চেয়েছে। এদের ভোট যদি বিজেপির পক্ষে পড়ত— তাহলে কিন্তু চিত্রটাই বিপরীত হতো। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যদি তার সমর্থক ভোটারদের এই অংশের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দূর করে তাদের কাছে টেনে আনতে পারে, তাহলে কংগ্রেস এবং বিরোধীদের ফোলানো বেলুন অনায়াসে চুপসে যাবে।

বিজেপির বিপর্যয় সত্যিই ঘটেছে ছত্তিশগড়ে। কোনও ব্যাখ্যাতেই বিজেপির এই বিপর্যয়কে আড়াল করা যাবে না। ছত্তিশগড়ের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহ ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সৎ। ছত্তিশগড়ের উন্নয়নে তাঁর অবদানও রয়েছে। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে, ২০১৩-র বিধানসভা নির্বাচনই কিন্তু রমণ সিংহের কাছে একটি সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছিল। ২০১৩-র বিধানসভা নির্বাচনেই কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির ভোটের ফারাক ছিল সামান্যই। মনে রাখতে হবে, ছত্তিশগড়ে এই মুহূর্তে কংগ্রেসের তেমন ওজনদার কোনও নেতা নেই। অজিত যোগীও কংগ্রেস ছেড়েছেন। তবু এই কংগ্রেসই ওই রাজ্য বিজেপিকে শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করেছে। ছত্তিশগড়ে ভোটের হিসাবটির দিকে তাকালে বোঝা যাবে, গ্রামীণ এবং বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিজেপি অত্যন্ত খারাপ ফল করেছে। গ্রামীণ ক্ষেত্র যে অবহেলিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত দু' বছর আগেই সতর্ক করেছিলেন সরকারকে। দু' বছর আগে তাঁর বিজয়া দশমীর ভাষণে গ্রামীণ ক্ষেত্রের প্রতি আরও নজর দেওয়ার কথা তিনি বলেছিলেন। শুধু ছত্তিশগড় নয়, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশেও গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিজেপির আশানুরূপ ফল হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে সার্বিকভাবে গ্রামীণ ক্ষেত্রে একটু অবহেলাই হয়েছে। যদিও সম্প্রতি কৃষিক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই পদক্ষেপ অনেক আগে হলে বিজেপি হয়তো তাদের সরকার রক্ষা করতে পারতো। তবে, ২০১৯-এর নির্বাচনের আগে গ্রামীণ ক্ষেত্রের ক্ষতে কিছু প্রলেপ লাগাতেই হবে বিজেপিকে। একথাও অস্বীকার করে লাভ নেই, নোটবন্দি এবং জি এস টি চালু বিজেপির কিছুটা বিপক্ষে গিয়েছে। নোটবন্দি এবং জি এস টি-র উদ্দেশ্য যে সৎ এবং সাধু— এ নিয়ে কারও কোনও দ্বিমত নেই। সমস্যাটি ঘটেছে তার বাস্তবায়নে। সেক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে এতটা তাড়াহুড়ো না করাই শ্রেয় ছিল।

এর পাশাপাশি এই তিনটি রাজ্যেই এক শ্রেণীর বিজেপি নেতার প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বিজেপির বিরুদ্ধে গিয়েছে। যেমন, ছত্তিশগড়ের রমণ সিংহ বা মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিংহ চৌহান কাজের মানুষ সবাই মানেন। কিন্তু ওই দুই রাজ্যের বেশ কিছু বিজেপি নেতার আচার আচরণ এবং জীবনযাপন ক্ষুব্ধ করেছিল সাধারণ মানুষকে। এরই পাশাপাশি রয়েছে স্বঘোষিত কিছু হিন্দুত্ববাদীর তাণ্ডব। এই তাণ্ডব হিন্দুত্ব আন্দোলনেরই ক্ষতি করেছে। বহু বিজেপি সমর্থকও এদের তাণ্ডবে বিরক্ত হয়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সজাগ এবং সতর্ক হতে হবে। এবং এটা হতে গেলে দরকার আত্মসমালোচনা।

তিন রাজ্যের ফলাফল বিজেপির সামনে আত্মসমালোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বকে বুঝতে হবে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে আত্মসন্তুষ্টির জায়গায় তারা নেই।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ঊনিশে বিজেপি ফিরবে আরও বেশি শক্তি নিয়ে

সনাতন রায়

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়। এই তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় গোটা দেশ জুড়ে একটা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তা হলো, ২০১৯-এর নির্বাচনে কি তাহলে বিজেপির পরাজয় অনিবার্য? বিরোধীদের দীর্ঘ পাঁচ বছরে চরম হতাশাজনক পরিস্থিতিতে সামান্য আশার আলো যে শোরগোল ফেলে দিয়েছে, রঙিন আবিরের রঙ মাখা সূর্যালোকে যে স্বপ্ন ফের রঙিন হয়ে উঠেছে— এ প্রশ্ন তারই প্রতিক্রিয়া। পাশাপাশি জনমনে একই সময়ে আরও একটি প্রশ্ন ঘোরাফেরা করতে শুরু করেছে। তা হলো, ভারতবর্ষ কি তাহলে ফের সেই গতানুগতিক ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালেই মুখ লুকোবে? আর্থিক সংস্কার, পরিকল্পিত পররাষ্ট্রনীতি এবং গত পাঁচ বছরে উন্নয়নের যে অভিজ্ঞতা মানুষ অর্জন করেছে, তা কি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আগামী নির্বাচনে? নাকি গোটা দেশ ফের এক জোট-রাজনীতির ভয়াবহ আগ্রাসনের শিকার হয়ে আবার ১৯৭৭-৮২-র মতো চরম অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষকে?

দুই শিবিরের প্রশ্নগুলোই অত্যন্ত চিন্তাকর্ষক। বিরোধীমহলের আশার আলো জাগার যেমন কিছু কারণ উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, তেমনি জনমনের চিন্তাভাবনাগুলোকেও অকিঞ্চিৎকর বলে ঠেলে ফেলা যাবে না। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা দেশে গেরুয়া আবিরের যে ঢেউ উঠেছিল— নিঃসন্দেহে ২০১৮-য় সেই ঢেউ কিছুটা হলেও স্তিমিত। অন্তত বিরোধী শিবিরের কাছে। কারণ ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৭টি লোকসভার উপনির্বাচনে বিজেপির ফলাফল তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। কারণ এই সময়ের মধ্যে বিজেপি তার জেতা কয়েকটি আসন ধরে রাখতে পারলেও, কংগ্রেসের কাছে খুইয়ে বসেছে মধ্যপ্রদেশের রতলাম এবং পঞ্জাবের গুরুদাসপুর আসন দুটি। কর্ণাটকে যেভাবেই হোক না কেন, কংগ্রেসের কাছে বিজেপি-কে হার মানতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত এবং অবশেষে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও ধরে রাখা যায়নি বিজেপির অন্যতম গড় রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়।

প্রশ্ন হলো এই হার কেন? এই প্রশ্নের উত্তর থেকেই খুঁজে নিতে হবে সেই মহার্ঘ্য প্রশ্নটির উত্তর— ২০১৯-এর রাজনীতির কোন রঙে রঙিন হবে ভারতবর্ষ?

তার আগে অবশ্য একবার দেখে নেওয়া দরকার, যে সময়ের মধ্যে দেশের উপনির্বাচনগুলিতে বিজেপির ফলাফল তেমন আশাব্যঞ্জক হয়নি (তার মানে অবশ্য এই নয়, কংগ্রেস বা বিরোধী অন্যান্য দল বিজেপিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে), সেই সময়ের মধ্যেই বিজেপি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সামাজিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে কোন কোন রাজ্য ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে সমস্ত বিরোধী দলকে হটিয়ে বিজেপির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্যগুলি হলো : (১) অরুণাচলপ্রদেশ, (২) অসম, (৩) গোয়া, (৪) গুজরাট, (৫) হরিয়ানা, (৬) হিমাচলপ্রদেশ, (৭) জম্মু ও কাশ্মীর, (৮) মহারাষ্ট্র, (৯) ত্রিপুরা, (১০) উত্তরপ্রদেশ, (১১) উত্তরাখণ্ড। এছাড়া



জোট শরিক বা শরিক না হয়েও সহযোগী হিসেবে বিজেপির সঙ্গী দলগুলি যে যে রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে সেগুলি হলো : (১) বিহার (জনতা দল ইউনাইটেড), (২) মণিপুর (ন্যাশানাল পিপলস ফ্রন্ট), (৩) মেঘালয় (ন্যাশানাল নেপাল ফ্রন্ট), (৪) নাগাল্যান্ড (ন্যাশানাল ডেমোক্রাটিক পিপলস পার্টি), (৫) ওড়িশা (বিজু জনতা দল), (৬) সিকিম (সিকিম ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট)। একই সময়ে বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক জয়ের ছবিটা কেমন? কংগ্রেস ফিরে পেয়েছে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পুদুচেরি ও পঞ্জাব। অন্ধ্রপ্রদেশে ২০১৪ সালে জিতেছিল তেলুগু দেশম পার্টি বিজেপির জোটসঙ্গী হিসেবেই। এখন ওই দল সাময়িকভাবে হলেও কংগ্রেসের সঙ্গী। দিল্লিতে ক্ষমতায় আসীন আম আদমি পার্টি। কর্ণাটকে জনতা দল, তাও কংগ্রেসের চেয়ে কম আসন জিতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করে। কেরলে কংগ্রেসকে হারিয়ে ফিরেছে সিপিআইএম। ঠিক একইভাবে মিজোরাম হেরেছে কংগ্রেস মিজো ন্যাশানাল ফ্রন্টের কাছে। তামিলনাড়ুতে রয়ে গেছে এ আই এ ডি এম কে। তেলেঙ্গানায় (নতুন রাজ্য) টি আর এস। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে কংগ্রেসের পুরোপুরি বিদায়।

প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক— গোটা ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশের মানুষ যখন বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে তাহলে কী এমন ঘটল যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়কে সামান্য ভোটের ব্যবধানে হলেও হারাতে হলো বিজেপিকে? কারণগুলিকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ না করলে বোঝা যাবে না— ২০১৯ বিজেপি ফিনিশ বলে যেসব কোণঠাসা বিরোধী নেতা-নেত্রীরা ফোঁস করতে শুরু করেছেন, তা কতখানি অসার।

প্রথমে রাজস্থান। রাজস্থানে বিজেপির হারের প্রথম এবং প্রধান কারণ হলেন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া। মারওয়া রাজ পরিবারের এই কন্যা বরাবরই নাক উঁচু চরিত্রের এবং উত্থান মূলত নিজেরই ভাই মাধবরাজে সিন্ধিয়া এবং তাঁর পুত্র জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বিরোধী হিসেবে। জনগণের সঙ্গে ইদানীং তাঁর যোগসূত্র প্রায় ছিঁড়ে যাওয়া সুতোর ওপরই ঝুলছিল। তার সঙ্গে মিশেছিল কৃষকদের দাবিদাওয়ার সমর্থনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া। এমনকী হিন্দু জনভোটকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে ধরে রাখার ব্যর্থতা। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা অবশ্য দরকার— রাজস্থানে কংগ্রেস অচ্ছুত হয়েছিল সেই ১৯৭৭-এই। সেবার ক্ষমতায় এসেছিল জনতা দল, শরিক ছিল অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি-ও এবং এই বিজেপি-ই রাজস্থানে ক্ষমতায় থেকেছে ১৯৯০-৯২, ১৯৯৩-৯৮, ২০০৩-২০০৮, ২০০৮-২০১৩ এবং ২০১৩-১০১৮। অর্থাৎ ২০০৩ থেকে টানা ১৫ বছর। সরকার এবং শাসক-বিরোধী মনোভাব তো গড়ে ওঠারই কথা। এটাই তো ভারতবর্ষের ভোট রাজনীতির ট্র্যাডিশন। রাজস্থান সেই ঐতিহ্যর ফলেই জনরোষের শিকার হয়েছে বললে কি অত্যুক্তি বলে মনে হবে?

ছত্তিশগড়। ২০০৩ থেকে ২০১৮-এ রাজ্যের গঠনের দিন থেকেই এখানে প্রশাসনে আসীন ছিল বিজেপি। এ রাজ্য প্রাকৃতিক ভাবে সম্পদসম্পন্ন হলেও মানবিক সম্পদের দিক থেকে এ রাজ্যের পরিস্থিতি চিরকালই হতাশাব্যঞ্জক। তার ওপর এ রাজ্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মাওবাদীদের আগ্রাসী মনোভাব। প্রশাসনিক দিক থেকে এ সমস্যাগুলির মোকাবিলা সহজ নয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহের জনপ্রিয়তা এবং তাঁর মানবিক উন্নয়নমুখী পদক্ষেপগুলির তাগিদেই এ রাজ্যে পরপর তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দাঁত ফোটাতে পারেনি। একদা মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগী ক্রমাগত পিছিয়েছেন এবং এবারের নির্বাচনেও বি এস পি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে জোট গঠন করেও জিতেছেন মাত্র একটি আসনেই। এবং অবশ্যম্ভাবী হিসেবেই এ রাজ্যে উঠে এসেছে কংগ্রেস। কারণ দীর্ঘদিনের প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠায় অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। তার ওপর আছে বামপন্থী এবং অতি-বামপন্থীদের পর্দার আড়ালে গড়ে ওঠা দেশদ্রোহী প্রয়াস, যে প্রয়াসে শোনা যায় পশ্চিমবঙ্গেরও প্রধান দুটি বিরোধী দলেরও উস্কানি রয়েছে যথেষ্ট।

মধ্যপ্রদেশের ফলাফলটা অস্বাভাবিক। এমনকী বিজেপিও ভাবেনি যে মধ্যপ্রদেশ হাতছাড়া হবে। এবারের নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশই ছিল নজরকাড়া রাজ্য যেখানে ১৯৯০-৯২ এবং তারপর ২০০৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত টানা প্রশাসনিক ক্ষমতায় ছিল বিজেপি-ই। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শিবনাথ সিংহ চৌহানজীর জনপ্রিয়তাও ছিল অটুট। এবং হয়তো বলা যেতে পারে মধ্যপ্রদেশই একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজ্যস্তরের কারণের চেয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে কারণ হিসেবে উঠে এসেছে কিন্তু কেন্দ্রীয় কারণসমূহ যা গোটা দেশকেই কিছুটা হলেও ভাবাচ্ছে।

কংগ্রেসের শক্তির কিছুটা পুনর্নবীকরণের পিছনে রয়েছে নতুন চিন্তাধারায় পুষ্ট রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন যুবশক্তি এবং কংগ্রেস ও বিজেপিকে বাদ দিয়ে সমাজবাদী পার্টি কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস অথবা তেলুগু দেশম পার্টির মতো কিছু বিরোধী দলের হিন্দুত্ব বিরোধী গোয়েবলসীয় প্রচার।

এতৎসত্ত্বেও শতাংশের হিসেবে একমাত্র ছত্তিশগড় ছাড়া অন্য দুটি রাজ্যে বিজেপির হার হয়েছে সামান্য ভোটের ব্যবধানেই। এবং বিরোধীদের একটানা অতিপ্রচারই যে হার, তাকে সংশোধন করে নেওয়াটা খুব একটা কষ্টকর নয়।

এই যখন সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তখনও কিন্তু বিজেপি বিরোধী শক্তিই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে— ২০১৯ বিজেপি ফিনিশ। কোন পরিপ্রেক্ষিতে? যখন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষকে উঠিয়ে নিয়ে আসছে অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে। এখন অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল ভারতবর্ষ গোটা বিশ্বের আধুনিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংস্কারের পথে পা বাড়িয়েছে। যখন ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া জনসমাজ, মহিলা সমাজ বেঁচে থাকার নতুন অর্থের সন্ধান পাচ্ছে। যখন গোটা দেশ জুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো সংখ্যালঘু সন্ত্রাসবাদীরা প্রতিদিন পিছু হটছে। প্রতিবেশী সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র পাকিস্তান গোটা বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘড় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। এবং যে মুহূর্তে ভারতবর্ষ মুক্ত হতে চাইছে বিদেশি সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে এবং দেশকে সনাতনী ঐতিহ্যের ধারায় প্রবাহিত করতে।

বিরোধীদের অভিযোগ, মোদী মৌলবাদী, মোদীর আমলে মানুষের চেয়ে গোমাতার সম্মান বেশি। মোদীর নোট বাতিল নীতি গোটা দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে। জি এস টি-প্রবর্তন করে ছোটো ব্যবসায়ীদের সর্বনাশ করেছেন। কৃষকদের পেটে লাথি মারছেন। বিরোধী শক্তিদের টুঁটি টিপে ধরে রাজনৈতিক অগ্রাসন চালাচ্ছেন। এবং আর এস এস, বজরঙ্গ দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ছত্রছায়ায় রামমন্দির তৈরিকে ইস্যু করে হিন্দু ভাবাবেগকে আচ্ছন্ন করে ২০১৯-এর ভোট বৈতরণী পার হতে চাইছেন।

এসব অভিযোগ যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের হাজারো জনমুখী এবং সমাজমুখী প্রকল্পের এগুলি কয়েকটি নজির মাত্র। কোনও রাজ্যই এমনকী একটিও বিরোধী শক্তি দ্বারা পরিচালিত রাজ্য প্রশাসন অস্বীকার করতে পারবে না যে

গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন নীতিগুলি ভারতবর্ষের দিশার উন্নয়নের নিরিখে নবমূল্যায়ন ঘটেছে।

১। নোট বাতিল— ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতা আর অসাধু ব্যবসায়ীদের ঘরে ঘরে জমানো কালো টাকার পাহাড় রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেছে। নতুন করে কালো টাকার সঞ্চয় করার সাহস আর বুক বাজিয়ে করতে পারছেন না কালো টাকার ব্যবসায়ীরা।

২। জি এস টি— রাজ্যগুলিতে কর আদায়ে সুদিন এসেছে এবং তা প্রায় বিনা আয়াসে। এর অর্থ গোটা দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ মজবুত থেকে মজবুততর হয়ে ওঠা সেকথা প্রায় সব রাজ্যই স্বীকার করতে শুরু করেছে— এমনকী বিরোধীরাও।

৩। বিদ্যুতায়ন--- ভারতবর্ষের ১৮৪৫০ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পূর্ণ করা। সোলার পাওয়ারের পরিকাঠামোর বাস্তবায়ণ ঘটানো।

৪। আয়ুষ্মান ভারত--- গোটা দেশকে আয়ুর্বেদিক পথে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলা।

৫। হৃদরোগে অপরিহার্য স্টেন্ট এবং হাঁটুর অপারেশনের মতো ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ কমিয়ে আনা।

৬। মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে বেকারত্ব দূরীকরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৭। ৩ লক্ষ ভুয়ো কোম্পানিকে চিহ্নিতকরণ।

৮। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডের বাধ্যতামূলক ব্যবহার চালু করে বেআইনি ব্যবসা এবং অর্থপাচার বন্ধ করা।

৯। পাঁচ কোটি গরিবের ঘরে গ্যাস সংযোগ দেওয়া।

১০। ভারতবর্ষকে ডিজিটাল টেকনোলজির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

১১। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন দেশ হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

১২। স্কিল ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতবাসীকে দক্ষ থেকে দক্ষতর করে তোলা।

১৩। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে দেশকন্যাদের শিক্ষিত এবং স্বনির্ভর করে তোলা।

১৪। জনধন প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত ভারতবাসীর কম খরচে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা।

১৫। অতি অল্প খরচে জীবনবিমার ব্যবস্থাকরণ।

১৬। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় শিশু কন্যাদের আর্থিক স্বনির্ভর করে তোলা।

১৭। রান্নার গ্যাসে বিশাল অঙ্কের ভরতুকি প্রদান।

১৮। গোটা দেশে যোগ সচেতনতা গড়ে তোলা।

১৯। ধনুষ প্রকল্পে শিশুকন্যাদের সাহায্য দান।

২০। গোটা দেশে এ আই আই এম এস-এর ধরনের হাসপাতাল গড়ে তোলা।

২১। মোদী কেয়ার প্রকল্পের অধীনে ৫০ কোটি ভারতবাসীকে যুক্ত করা।

২২। রাশিয়া, জাপান, কানাডা, ফ্রান্সের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি সম্পন্ন করা।

২৩। পোস্টাল পেমেন্ট ব্যাঙ্ক গঠন।

২৪। নকশালপন্থীদের জাতীয় স্রোতে আকর্ষণ করা।

২৫। তিন তালাক ইস্যুতে মুসলমান মহিলাদের পাশে দাঁড়ানো।

২৬। গোটা দেশকে আই এস-সহ ইসলামি সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত করতে এন আর সি প্রকল্প চালু করা।

২৭। পাকিস্তানকে উচিত সাজা দিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা।

২৮। উজ্জ্বলা যোজনায় গরিব মহিলাদের রান্নার সুবিধায় স্বল্পমূল্যে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা।

২৯। ভারতবর্ষের জি ডি পি-র বৃদ্ধি।

৩০। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি প্রকল্প চালু করা।

৩১। কৃষকদের জন্য স্বল্পমূল্যে সার সরবরাহ প্রকল্প চালু করা।

৩২। কৃষকদের স্বল্প সুদে কৃষিঋণ দেওয়া।

৩৩। দেশজুড়ে হাইওয়ে তৈরির কাজ চালু রাখা।

৩৪। গোটা সামরিক বাহিনীকেই বিশ্বমানের প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদে উন্নীত করা।

৩৫। বুলেট ট্রেন চালু করার প্রয়াস।

৩৬। কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভরতুকি দান।

৩৭। স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বিভিন্ন রাজ্যকে সুবিধাদান।

৩৮। গোধন রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়া।

৩৯। ঋণ গ্রহণকারী ভারতবর্ষকে ঋণদানকারী দেশে উন্নীত করা।

৪০। দলিত মানুষকে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা।

৪১। কংগ্রেস আমলের ব্যাঙ্ক দুর্নীতিগুলিকে চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

৪২। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্পে ভরতুকি দান।

৪৩। একপদ এক পেনশন নীতি চালু করা। ৪৪। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি।

৪৫। ব্যাঙ্কের ঋণ নেওয়ার পদ্ধতির সরলীকরণ।

৪৬। ব্যাঙ্কের সুদ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা।

৪৭। মুদ্রা যোজনায় ছোটো শিল্পকে আর্থিক ঋণদান।

৪৮। যুবশক্তিকে খেলাধুলায় উৎসাহদানে পৃথক ব্যবস্থাপনা।

৪৯। ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প।

৫০। ভারতবর্ষের সুরক্ষার স্বার্থে গৃহীত বিবিধ ব্যবস্থা।

রাজ্যস্তরে যে উন্নয়নের নজির আজ রাজ্যগুলি রাখতে পারছে, মানুষের সামনে জোর গলায় উপস্থাপন করতে পারছে, তার প্রায় সবকটিই নামে বা বেনামে কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় সরকারি অর্থেই দেশের সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে পুষ্ট।

যাঁরা শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্বের স্ট্যাম্প দিয়ে চিহ্নিত করে গোটা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছেন, তাঁরাও জানেন, হিন্দুত্বের সুরক্ষা ছাড়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ একেবারেই সুরক্ষিত নয়। শুধুমাত্র মুসলমানদের ভোট কাড়ার অছিলায় তাঁরা যুগ যুগ ধরে যে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে রয়েছেন, জনগণ তা চিনে ফেলেছে। জনগণ দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সে মুখোশ টেনে ছিঁড়বেই।

গোমাতা রক্ষা নিয়ে বাড়াবাড়ির রাজনীতিকে দোষারোপ করছে যেসব বিরোধী শক্তি, তাঁদেরও বোঝা উচিত— একদা ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম বনিয়াদ ছিল গোধন। আজও গোবলয় অঞ্চলে বহু পরিবার গোধন নির্ভর। এমনকী লালুপ্রসাদ যাদবের মতো নেতাও গোপালনে যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির নজির রেখেছেন, যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে তার পরিবার তাও গোধনের ওপরেই নির্ভরশীল।

হিন্দুত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ির অভিযোগে বিজেপিকে অভিযুক্ত করে যে সব বিরোধী দল রাজনৈতিক পতাকা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তাঁরা খুব ভালোভাবেই বোঝেন— আসলে হিন্দুত্বকে নিয়ে রাজনীতিটা করছেন তাঁরাই, বিজেপি নয়। ছত্তিশগড়ের এবারের নির্বাচনেও কংগ্রেসের প্রচার ছিল সফট হিন্দুত্ব নীতিরই অনুসারী। এমনকী পশ্চিমবঙ্গে আজ বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিতে নেমে তৃণমূল কংগ্রেসকেও হিন্দুত্ব নীতিই গ্রহণ করতে হচ্ছে। কারণ হিন্দুরা শুধু সংখ্যাগুরুই নয়, ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ আবহমানকাল ধরেই। হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের প্রতীক, আবেগ, অভিমান। মুসলমানদের মতো বিদেশি ধর্মীয় এবং শত্রুভাবাপন্ন আঘাত সে আবেগ এবং শক্তিকে কোনওভাবেই বিনষ্ট করতে পারবে না।

প্রকৃতপক্ষে ২০১৯ সালে ভারতবর্ষের লোকসভা নির্বাচন হবে এসবের দিকে তাকিয়েই। নিঃসন্দেহে যে বিষয়গুলি নিয়ে মানুষ ভাববেই সেগুলি হলো :

১। **অর্থনৈতিক সংস্কার :** পুরনো নোট বাতিল এবং নতুন নোটের প্রচলন নিঃসন্দেহে এক বিরাট অর্থনৈতিক সংস্কার। বিরোধীরা এমনকী কংগ্রেসও মুখে যাই প্রচার করুক না কেন, দেশ থেকে কালো টাকা সঞ্চয় এবং বিদেশে পাচারের ক্ষেত্রে এত বড় পদক্ষেপ প্রয়োজন সত্ত্বেও আগে কেউ নিতে সাহস করেনি। এমনকী এই নীতির ধ্বজাবাহী কংগ্রেসও নয়। মানুষের কিছুটা দুর্ভোগ হয়েছে সাময়িক ভাবে। বিরোধীরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে মিথ্যা গোয়েবলসীয় প্রচার চালিয়ে। আখেরে লাভবান হয়েছে দেশ এবং দেশের মানুষ। সর্বনাশ হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিরই যাদের রাজনীতিই ছিল কালো টাকা নির্ভর। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির মতো দল যারা সাদা টাকার অভাবে ২০১৭ সালের নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। অথবা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দল যারা সারদা চিট ফান্ড বা রোজ ভ্যালি চিট ফান্ডের কালো টাকায় নিজেদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়েছিল বলে সি বি আই অভিযোগ তুলে আজ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে জি এস টি শুধু বাণিজ্যিক কর প্রদান পদ্ধতির সরলীকরণই করেনি, রাজ্যগুলিকে কর আদায়ে বলীয়ান করেছে। রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক বনিয়াদ মজবুত করেছে।

পাশাপাশি ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির নানাবিধ সংস্কার শুধু সাধারণ মানুষকে ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ে আগ্রহই করেনি, মানুষকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রতি নির্ভরশীল হতে শিখিয়েছে। একের পর এক ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ধরে ফেলে হাজার হাজার কোটি অনাদায়ী টাকা দেশে ফেরানোর জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত পেনশনধারীদের জন্য ব্যাঙ্কের সুদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশেষ টার্ম ডিপোজিটের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে চড়া সুদ দিয়ে। ফলত সার্বিকভাবে দেশ এক অর্থনৈতিক মজবুতির পথে পা বাড়িয়েছে। মানুষ নির্ভর করবে সেই মজবুতির ওপর। বিরোধীদের মিথ্যা প্রচারের ওপর নয়।

২। **সামাজিক সংস্কার :** ভারতবর্ষে এতকাল ধরে মহিলাদের সমাজের অন্ধকার কোণে ফেলে রাখা হয়েছিল। অশিক্ষা, অজ্ঞানতার অন্ধকার নিমজ্জিত ছিল মহিলা সমাজ। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেই মহিলাদের শিশুকন্যা থেকে বৃদ্ধা— সম্মান দিয়েছে। সামাজিক সম্মান। পারিবারিক সম্মান। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, জীবনবিমাকরণ, পুলিশের চাকরিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ, ট্রেনের চালক হিসেবে মহিলাদের নিযুক্তি, সামরিক বাহিনীতে মহিলাদের বেশিমাত্রায় সুযোগ দান ইত্যাদি নানা প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলারা আজ বিশ্ববাসীর কাছে স্বনির্ভর এক সামাজিক অংশ হয়ে উঠেছে। গরিব মানুষ নানা প্রকল্পের মাধ্যমে বেঁচে থাকার নতুন রসদ পেয়েছে। কৃষক পেয়েছে ফড়ে মুক্ত বিপনন ব্যবস্থা। সহজে কৃষি ঋণ, কৃষি যন্ত্রপাতি ঋণ, ঋণ মকুবের সুবিধা, উন্নত মানের বীজ বিনামূল্যে, তৈরি বাজার, ভরতুকিযুক্ত সার এবং সর্বোপরি সামাজিক সম্মান। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন— রাজস্থানে কৃষকের আত্মহত্যা, কৃষক হত্যার নামে যে অতিপ্রচার চালিয়েছিল কংগ্রেস, সিপিআইএম, সমাজবাদী পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস-সহ প্রায় সব বিরোধী দল তাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে একটি ফলাফল। মন্দসৌর যেখানে কৃষক আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে কৃষক হত্যার ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল সেখানেই চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দুটিতে জিতেছে বিজেপি। যদি সত্যিই বিজেপি কৃষকবিরোধী হতো তাহলে মন্দসৌরের ফলাফল হতো নিঃসন্দেহে অন্যরকম। একই সঙ্গে স্কিল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারত্বের অন্ধকারে নিমজ্জমান যুবশক্তির ভেতর নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বড়ো শিল্পের পাশাপাশি ছোটো শিল্পের অগ্রাধিকার, নানাভাবে সৎপথে আয়ের পথ দেখিয়ে মোদী সরকার যুবশক্তির সামনে হাজির হয়েছে নব দিশা হয়ে। বিরোধীরা সাময়িকভাবে ভোটের ফলাফলে কিছু রদবদল ঘটালেও এর সামাজিক প্রকল্প মানুষ এত সহজে ভুলবে না। বিভ্রান্তিও কাটবে। তার নিরিখেই নির্ধারিত হবে ২০১৯-এর ভোটের ফল।

৩। **হিন্দুত্ব :** ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ। ধর্মগত কারণের চেয়ে অনেক বড়ো কারণ প্রকৃতিগত ভাবেই ভারতবর্ষের মানুষ হিন্দু। হিন্দুত্ব শুধু আবেগ নয়, এক ধরনের আচরণ। এক ধরনের বিশ্বাস, জীবনের চলার পথে আলোকজ্জ্বল এক জ্যোতির্ময় দিশা। যে দিশাকে প্রাচীন ভারতবর্ষের মজ্জাগত প্রকৃতি থেকে তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যিনি চেয়েছিলেন, হিন্দুত্বের আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনাচরণের মাধ্যমে ভারতবর্ষের খোলনলচে বদলে দিতে এবং বিশ্ববাসীর সামনে এক গর্বের জাতিকে প্রতিষ্ঠা করতে। মনে রাখা দরকার— হিন্দুত্বের গর্বে গর্বিত হওয়া মানে ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে নিজেদের বলশালী করে তোলা। হিন্দুত্বের মহিমায় বিকশিত হওয়া মানে মুখোশধারী ধান্দাবাজ ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষদের মুখোশ খুলে দেওয়া। হিন্দুত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া মানে এক দুর্নীতিমুক্ত, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত দেশের নাগরিক হওয়া। কে দুর্গা ভজনা করবেন আর কে রামপূজন করবেন— সেটা নিয়ে রাজনৈতিক বিভেদ তৈরি হতে পারে, কিন্তু তাতে দেশের মানুষের মন থেকে হিন্দুত্বকে

মুছে দেওয়া যাবে না। আজ সব রাজনৈতিক দলই সংখ্যালঘুদের জন্য কুমিরের কান্না কেঁদেও আসলে হিন্দুত্বেরই ভজনা করছেন। বিজেপি যা সোজাসুজি করছে প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সেটাই অনুসরণ করছে ঘুরপথে। মুসলমানদের কাছে ওই ভণ্ডামি একদিন ধরা পড়বেই। এমনকী সংখ্যালঘুরাও বুঝতে পারবেন— বিজেপি বা আর এস এসের হিন্দুত্ব মানে দেশ, দেশের উন্নতি। বিরোধ যা তা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। বেআইনি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শত্রুদের এদেশে অশান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। সে লড়াই বিজেপির রাজনৈতিক লড়াই নয়। সে লড়াই দেশের সুরক্ষার লড়াই— ভারতীয় মুসলমান জনসমাজও বিরোধীদের হাজার অতি প্রচার সত্ত্বেও আজ বুঝতে পারছেন। তাই মুসলমান প্রধান এলাকাগুলিতেও ধীরে ধীরে বিজেপির প্রভাব বাড়ছে। ২০১৯-এর নির্বাচনে তার প্রতিচ্ছবি পড়বেই।

‘২০১৯ বিজেপি ফিনিশ’ স্লোগানকে নস্যির মতো উড়িয়ে দেবে মানুষ। আগামী ৪/৫ মাসের লড়াই প্রকৃত বনাম ছদ্মবেশীর। নীতি বনাম দুর্নীতির। উন্নতি বনাম অবনমনের। মিথ্যার অতি প্রচার বনাম সত্যের দর্শন।

ভোটের অঙ্ক : সর্বোপরি রয়েছে ভোটের অঙ্ক। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে তিনটি রাজনৈতিক শিবির সক্রিয়। প্রথম, বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্যাশানাল ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্স। দ্বিতীয়, কংগ্রেস। আর তৃতীয় ‘মহানেত্রী’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের বিরোধী জোটবন্ধন যা এখনও সেভাবে জমাট বাঁধতে পারেনি। এর মধ্যে গোটা দেশের নিরিখে নিঃসন্দেহে এগিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। সন্দেহ নেই, নানা ধরনের আর্থিক সংস্কার সাময়িক ভাবে হলেও ভারতবাসীকে প্রাথমিকভাবে কিছুটা ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে মিশেছে বিরোধীদের মিথ্যা প্রচার আর উস্কানি। এর ফলে সাময়িক ভাবে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলিকে। বিরোধীদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে সত্যকে তুলে ধরতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে— রাম কোনও ধর্মীয় নেতা নন। তিনি শৌর্য, বীর্য এবং সামাজিক সংস্কার সাধনের প্রতীক। গোধন আমাদের গ্রামীণ ভারতবর্ষের অর্থনীতির সহায়ক শক্তি। বোঝাতে হবে, মোদীর ঘনঘন বিদেশ সফর ব্যক্তিগত ভ্রমণের স্বার্থে নয়— সবাই দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে বলীয়ান করার জন্য এবং পাকিস্তানের মতো ক্ষতিকারক জেহাদি ভারত বিদ্বেষী বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলার জন্য। যা আজ অনেকটাই হস্তগত। কারণ আজ আমেরিকাও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব। রাজস্থান বা মধ্যপ্রদেশের ফলাফল একটা সাময়িক বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। আর কিছুটা স্থানীয় বিজেপির কাছে চোখে আঙুল দাদার ভূমিকাতেও। এই ফলাফল তাদের কাছেও শিক্ষা যে ‘অতি দর্পে হত লঙ্কা’ প্রবাদবচনটি বাস্তব, কাল্পনিক নয়। কংগ্রেস রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অগ্রাহ্য করার বিষয় নয়। কারণ ভারতবর্ষে এখনও ভোটের অঙ্কে তারা দ্বিতীয় একক রাজনৈতিক শক্তি। বিশেষ করে সনাতন রাজনীতির ভারতবর্ষ কংগ্রেসের মতো সফট রাজনীতিতে অনেকটা আস্থাশীলও। অতএব এসব অঙ্ক মাথায় নিয়েই এগোতে হবে। তবে, সবটুকুই নির্ভর করবে বিজেপির রণকৌশল কংগ্রেস বিরোধী হবে কোন স্তরে, কোন কোন তথ্যের ভিত্তিতে। মিথ্যা প্রচারের জবাব মিথ্যার প্রচার নয়। সত্যের প্রচার। মানুষ আজও সত্যের পূজারি। বোফর্স নাকি রাফায়েল— কোন দুর্নীতিতে কে জড়িত তা স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। বিজয় মাল্য, নীরব মোদীদের দুর্নীতির শুরু কংগ্রেস আমলে প্রচারে তা স্পষ্ট করতে হবে। ২০১৪ সালে মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলিও ধীরে হলেও তুলে ধরতে হবে। কীভাবে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি মানা হচ্ছে বা যেগুলি বাকি রয়েছে কীভাবে সেগুলি মানা হবে।

তৃতীয়ত, বাকি বিরোধী শিবির। এদের নিয়ে উদ্বেগের সত্যিই কি কোনও কারণ আছে? একমাত্র ২/১টি হাতে গোনা শক্তিশালী রাজনৈতিক আঞ্চলিক দল ছাড়া যারা নিজের রাজ্যে জোর, অন্য রাজ্যে অদৃশ্য। গোটা লোকসভা ভোটের নিরিখে এরা কখনই ধনুর্ধর শক্তি নয়। ১৯৭৭ সালে জনতা দলের অভিজ্ঞতা মানুষ এখনও ভোলেনি। ফলে এরা যতই প্রচার করুক না কেন, ভারতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলিই এখন চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে, আসলে তা বাগাড়ম্বর মাত্র। মানুষ জানে, ভোটের স্বার্থে গোঠবন্ধনের শরিকরা আসলে শীতের পরিযায়ি পাখি। সময় হলেই এরা ফুড়ুৎ করে উড়ে বসবে শাসকদলের দাঁড়ে। তা তিনি তেলুগু দেশমের চন্দ্রবাবু নাইডু কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়— যিনিই হন না কেন। দুজনেরই লক্ষ্য একবার ২/১ মাসের জন্য হলেও দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামের তালিকায় নিজেদের নামটা লেখানো। দেশ, মানুষ, দেশের ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি— এসব এঁদের কাছে অর্থহীন। স্বার্থই একমাত্র অর্থ এইসব দল ও নেতানেত্রীদের কাছে।

অতএব মাভৈঃ! ‘২০১৯ বিজেপি ফিনিশ’ স্লোগানকে নস্যির মতো উড়িয়ে দেবে মানুষ আগামী ৪/৫ মাসের লড়াই প্রকৃত বনাম ছদ্মবেশীর। নীতি বনাম দুর্নীতির। উন্নতি বনাম অবনমনের। মিথ্যার অতি প্রচার বনাম সত্যের দর্শন। মানুষের সম্মান বনাম অসম্মানের। সন্ত্রাস বনাম শান্তির। আগামী কয়েকটি মাস বিশ্বের দরবারে শিরদাঁড়া সোজা রাখা বনাম মাথা নিচু করার লড়াইয়ের সময়। সময় আগত— মানুষকে প্রকৃত হিন্দুত্বের অর্থ বোঝানো। আর দর্প ছেড়ে রাজনীতির ধর্মকে সম্মান জানানোর। মানুষই আসল শক্তি। ২০১৯ হবে সেই মানবিক শক্তির বিকাশের বছর। ‘ফিনিশ’ নয়, ‘দেখে নিস’-এর বছর।



সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গের চিন্তন বর্গ

গত ১ ডিসেম্বর সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের দু'দিনের চিন্তন বর্গ অনুষ্ঠিত হয় নবদ্বীপের নরহরি ধামে। দক্ষিণবঙ্গের আঠারোটি শাখা থেকে আগত পঁয়তাল্লিশ জন কার্যকর্তার উপস্থিতিতে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে চিন্তন বর্গের সূচনা করেন মঠাধ্যক্ষ কাঞ্চনপ্রভু।



তিনি মহাপ্রভুর পদধূলিধন্য এই শ্রীক্ষেত্রে সকলকে স্বাগত জানিয়ে, মহাপ্রভুর কাছে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ সংস্কারভারতীর এই চিন্তন বর্গের সাফল্য কামনা করে প্রার্থনা জানান।

দু'দিনের বর্গে ছ'টি অধিবেশনে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম উপদেষ্টা রন্তিদেব সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক কাজকে আরও মজবুত করে তুলতে প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক ভরত কুণ্ডু, কোষ প্রমুখ গোপাল কুণ্ডু, সংগঠন সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণব আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষক ব্রজদুলাল বন্ধু। দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বৈচারিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত। অসমের মতো বাংলায় জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এন আর সি-র প্রয়োজনীয়তা, কেরলে শবরীমালা মন্দির নিয়ে দেশের হিন্দু সমাজের আবেগ ও তার বিশ্লেষণ, জাতীয় জীবনে বিজাতীয় ও বিদেশি সংস্কৃতির ভয়ানক আক্রমণের প্রতিবিধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশ্লেষাত্মক আলোচনা করেন তিনি। সহ সংগঠন সম্পাদক ও শিশুকিশোর প্রমুখ প্রবীর ভট্টাচার্যের, সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, বিজ্ঞান ও সামাজিক ধ্যান ধারণা নিয়ে প্রশ্নোত্তর-বিচিত্রা পর্ব, বর্গ আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। উদ্বোধন সত্রে সকলকে বৈষ্ণবীয় রীতিতে তিলক ও পাদুকা প্রদান, দ্বিতীয় দিন প্রভাতে নবদ্বীপ শাখার বাসুদেব সাহার নেতৃত্বে একাত্মতা স্তোত্র পাঠ, ভবেশ বসাক ও শ্রীমতী শর্মিলা সাহার যোগ্য পরিচালনায় মঠ সংলগ্ন মাঠে শারীরিক অনুশীলন এবং সংগীতশিল্পী শ্রীমতী সবিতা দত্তের পরিচালনায় মঙ্গল আরতির সময়ে সকল প্রতিনিধির মিলিত প্রয়াসে কীর্তন পরিবেশিত হয়।

শিলিগুড়িতে সংস্কৃতভারতীর রাজ্য সম্মেলন

গত ২৪-২৫ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতভারতীর রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ির মাড়োয়ারি পঞ্চায়েত ভবনে। সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ২০ জন মা-বোন-সহ ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর অখিল



ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ দেবপূজারি এবং সিকিম রাজ্যের মানব সম্পদ মন্ত্রকের অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারি ড. গণেশ ছেত্রী। উদ্বোধনী বক্তব্যে শ্রীদেবপূজারি সংস্কৃত ভাষাকে প্রাচীনকালের মতো অবার সাধারণ মানুষের উপযোগী করার ওপর জোর দেন। শ্রীছেত্রী সংস্কৃতভারতীর এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন— ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি এখন কম্পিউটারের পক্ষে বৈজ্ঞানিক ভাষা হিসেবে সংস্কৃতকে মান্যতা দিয়েছে। দু'দিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতভারতীর সংগঠন সম্পাদক কমল শর্মা, দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ এবং প্রচারক বাসুদেব পাল। সমাপ্তি পর্বে শিলিগুড়ির বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্কৃতভারতীর জেলার সহ-সংযোজক সিদ্ধিনাথ শর্মা।

বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি সামগ্রী আজও আকর্ষণ হারায়নি

চূড়ামণি হাটি

বাংলায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে কৌম নর-নারীরা মাটি-বাঁশ-কাঠের মতো সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিল্প বস্তুগুলি তৈরি করেছে। গ্রামবাংলার মাটির চালাঘর মূলত দাঁড়িয়ে থাকে কাঠ বা বাঁশের খুঁটির জোরে। ঘরামিরা ধাপে ধাপে ধাপে কাদা দিয়ে দেওয়াল তোলে; সূত্রধররা কাঠ দিয়ে নানা শৈল্পিক ভঙ্গিতে তৈরি করে দেন চালাঘরের চাল ধরে রাখার কাঠামো, বারুইরা খড় ও বাঁশ-বেত দিয়ে ঘরের চাল ছেয়ে দেন। ঘরের ভেতরের অংশটি সেজে ওঠে চালের ভার বহনকারী বামন আকৃতির কাঠের পুতুল, খোদাই করা কাঠের নানা কারুকাজে এবং বেত, সরকাঠি, ময়ূর-মাছরাঙার মতো রঙিন পাখির পালকে। বাঁশ-বেতের ভেনকি তাক এবং নক্‌শি ছাদতো রয়েইছে। চারকোণে ঝোলানো হয় বেতের তৈরি আনারস। নক্‌শি কাঁথা কিংবা শীতলপাটির চাঁদোয়া টাঙ্গানোর ঝোঁকও ছিল। অবশ্য এ ছবিগুলো হারিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে গুরুত্ব পায় মণিমুক্তোর ঝালর ও সোনার টুনিতে সাজানো মনসামঙ্গলে উল্লেখিত 'উদয় তারা ঘর'। ধানের মরাই দেখা যায়; কিন্তু হারিয়ে গেছে ধান ও কুঁড়ো মজুত রাখার জন্য তৈরি বাঁশের গোল কাঠামোর মাটির প্রলেপ চাপানো ডোলা।

উৎসবের দিনে বাঁশ পুঁতে তার ডগায় বাঁধা চোঙা-মাইক; এ দৃশ্য যেমন হারিয়েছে, তেমনি হারিয়ে গেছে উনুনশাল সংলগ্ন রান্নাঘরে আড়াআড়ি অবস্থানে থাকা বাঁশে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া শিকের গুরুত্ব। খাদ্যাদি রাখার জন্য রঙিন সুতো পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি আধার। ফাঁস তোলা ও বিনুনী গাঁথার কৌশলে তৈরি। প্রয়োজনে ভেতরের শূন্য অবস্থানটিকে সঠিক রূপ দিতে থাকে থাকে সাজানো সরু কঞ্চির বেড়ি। উনুন শালের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল ছিদ্র করা বাঁশের চোঙ। মাটির উনুনের জ্বালানি ঢোকানোর পথে কিংবা গুল-ঘুঁটে সাজানো উনুনের নীচের বড় ছিদ্রপথে বাঁশের চোঙটি ঢুকিয়ে ফুঁ দিয়ে আঁচের আগুন তোলা হতো। ছিদ্রহীন চোঙে রাখা হতো তেল এবং দুধ-দই। এক্ষেত্রে ওপরের অংশটি একটু চেরা করে কোটা। জাপানে বাঁশের চেয়ার মগ ছিল অবর্ণনীয়। বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে তৈরি হয় দরমার বেড়া। শত্রুপক্ষকে চমকে দেওয়ার মতো বাঁশের কেল্লা তৈরিতে দক্ষ ছিল বাংলার বনবাসীরা। বাঁশ হাতে রায়বেঁশে সৈন্য ছিল বাংলার গর্ব। পরবর্তীকালে জমিদারদের ঠ্যাঙারে লাঠিয়াল হয়ে সেই অহংকার হারিয়ে গেছে। রণপা বিজ্ঞাপনের চরিত্র। নৃত্যের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-নৃত্যের রূপ নিয়েছে। দুর্গ তোরণের বক্র রূপের মতো দুর্গা-চাল আর্থ চালচিত্রের বক্র কাঠামোটিও বাঁশের। প্রতিমা মূর্তির মূল কাঠামোও বাঁশ-খড়ের। কাগজ তৈরিরও কাঁচামাল বাঁশ। বাঁশের ঘরও হচ্ছে।

কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রেখে হাল্কা আগুনের তাপ বা ধোঁয়া খাইয়ে বাঁশকে কাজের উপযোগী করা হয়। বাঁশের লম্বা আঁশকে কাজে লাগানো হয় সুকৌশলে। বাঁশের কাজে দক্ষ বাংলার ডোম, বাগদি, মহালি, রাইতিরা। ছেলে-মেয়ে উভয়ই এ কাজ করে। শূদ্র ও নারী জাতির সংগ্রাম। বাঁশ-বেত শিল্পের উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল মেলে মণিপুর, ত্রিপুরা, অসম-সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে। নানা প্রজাতির বাঁশ ও বেত। পশ্চিমবঙ্গের বাঁশুলি ও তলতা বাঁশ উন্নতমানের এবং মালদার মাকলা বাঁশও বেশ উন্নতমানের। বাংলায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বনবাসীরাই বাঁশ-বেত শিল্পকে উচ্চ-মান দিয়েছে। দক্ষিণে বেত অপেক্ষা বাঁশের উপরই বেশি নির্ভরশীল। পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে তালপাতা, খেজুর পাতা, হেগলা বা হেঁসতি পাতা-ঘাস এবং পাতি বা মুঠা জাতীয় ঘাস। পশ্চিমবঙ্গে বাঁশ- বেতের কাজে দক্ষতার পরিচয় মেলে মালদার গাজল; মঙ্গলবাড়ি; সাহাপুর;



হরিশ্চন্দ্রপুর; আলপুর; উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার; কালিগঞ্জ; রায়গঞ্জ; দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুণ্ডি; কোচবিহারের কোতোয়ালি; দার্জিলিংয়ে সমরনগর; নকশালবাড়ি; নদিয়ার করিমপুর; সুভাষনগর; হুগলী খানাকুল থানার শঙ্খপুর; আরামবাগের সেনপুর গ্রাম; পূর্বমেদনীপুরের ঘাটাল; খাঞ্জাপুর; মৈতনা; বাঁকুড়ার ছাতনা; পুরুলিয়ার চড়িদা; হাওড়ার ডোমজুড়; জগৎবল্লভপুর; মাকরদহ; পাতিহাল; চব্বিশ পরগনার বিষ্ণপুরের দেউলি গ্রাম; একসময় কলকাতার চিৎপুরের ডোমপাড়াও এ শিল্পে সুনাম নিয়েছিল। আজ কলকাতায় প্লাস্টিকের রমরমা বাজার হলেও আধুনিক চিন্তায় বাঁশের নিজস্ব সৌন্দর্য এবং বেতের বাঁধন শিল্পীর কল্পনাগুণে আকর্ষণীয়। ব্লেড দিয়ে বাঁশের লম্বাটে আঁশকে গোল করে কাটা; তারপর লম্বালম্বি ভাবে আঁশ তুলে বাঁশকে অলংকৃত করা। এভাবে খোদাই কর্মের মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে নানা সৌখিন শো-পিস এবং আসবাবপত্র। মণ্ডপ সজ্জায়ও গুরুত্ব পাচ্ছে বাঁশের অলঙ্কৃত সৌন্দর্য। কাপড় ঢাকা বাঁশের কাঠামোতো আছেই।

গোরু বাঁধার গোঁজ থেকে গোরুর গাড়ি এবং গোরুর গাড়ির ঢেউ খেলানো ছদরিও বাঁশের। ধান বোনার ডালা থেকে বিয়ের চিত্রিত বরণডালাও বাঁশের। শস্যের খোসা উড়িয়ে দিতে ব্যবহৃত কুলোও মাঙ্গলিক প্রয়োজনে চিত্রিত হচ্ছে। লাল শালু জড়ানো ও কড়ি বসানো চুপড়িই হলো লক্ষ্মীর ঝাঁপি বা সিঁদুর চুপড়ি। বাঁশের সাহায্যে তৈরি হয় ঝুড়ি, চালুনি, ধুচুনি, ডোকা-থুনচে বা পিঠা কাল্লোয়াং। বনবাসীরা তৈরি করে খাড়া বা লাঙ্গা। মাটির কাজের জন্য কুমোররা তৈরি করে নেয় কাঠম কাঠি ও মাজা কাঠি। মাটির ঘরের দরজার শিকল দেওয়ার চেনা ছবি ছিল বাঁশের হুড়কো। বাঁশের মাচায় বসার স্বাদ অনেকের না মিটলেও; মইয়ের সঙ্গে সবারই পরিচয় আছে। ঢেঁকিতে পা দিতে হলে বাঁশের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। নৌকো তৈরির সময়ও বাঁশের ঠেক চাই। তির-ধনুক, টাঙ্গা-টাঙ্গি-বর্শার হাতল বাঁশের তৈরি। বাঁশ স্বয়ং নিজেও অস্ত্র বটে। মাছ ধরার কোঁচ, বানা, ছিপ, শটকা, পাঙ, ঘুনি, পলুই সবই বাঁশের তৈরি। নদীতে বড় মাছ ধরতে হালুক। মাছ রাখতে মাথায় এবং কোমরে বাঁধা খালুইও বাঁশের। বাঁশের দণ্ড ঘাড়ে নিয়ে হেঁটে যাওয়া হেলা-ভেলা-মালা ফেরিওয়ালার পিছু নিত গ্রাম্য শিশুর দল। কিনে নিতো বাঁশ-কাগজের পতিঙ্গা এবং বাঁশের বাঁশি। সরল, আড়, মুরলী, বেণু, নয়া, টিপরা নানা গঠনে নানা নামের বাঁশি। বাঁশ-কাগজের ঘুড়িও শিশুর কাছে আকর্ষণীয়। দাদু-ঠাকুমার হাতের পাখায় ঠাণ্ডা হতো দুরন্ত শিশুর মন। বাঁশ, মুরতা বেত, তালপাতা, খেঁজুর পাতা, নারকেল পাতা, কলার শুকনো খোলের বেতি, চুলের ফিতে, পালকে সেজে উঠতো শখের পাখা। প্রয়োজনে চিত্রিত। হাত পাখা সহজে ঘোড়াতে হাতলে সরু বাঁশের নল লাগানো। হিন্দু সমাজে মৃত ব্যক্তির নাতিরা শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যেয় ডোম-বাগদিদের তৈরি করে দেওয়া বাঁশ-রঙিন কাগজের তৈরি দোলা রথ-নৌকো কলা গাছের ডেলায় গেঁথে প্রদীপ জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়, সঙ্গে নাম-সংকীর্তন। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঁশের সরু কঞ্চি বা বেতের ছড়ি ছিল ভয়ের কারণ। কাঠের মুখোশের পাশাপাশি পরবর্তীকালে গুরুত্ব পেয়েছে বাঁশের মুখোশ। বাঁশের মুখোশ এবং বাঁশের কাট্- ডলগুলিকে ঘরসাজানোর কাজে লাগানো হচ্ছে। বাঁশের কাঠামো ও বেতের বাঁধনে তৈরি শোফাসেট, টি-টেবিল, পা ছড়িয়ে বসার চেয়ার আধুনিক চিন্তা-ভাবনায় বেশ আকর্ষণীয়। প্রয়োজনে রঙিনও হয়েছে। পায়াতে আঁটকে দেওয়া হচ্ছে নতুন গ্রামের কাঠের পুতুল। চেড়া বাঁশের আড়াআড়ি বাঁধুনিতে তৈরি সাধারণ মোড়া অপেক্ষা পিঠে ঠেস্ দেওয়া মসৃণ বেতে মোড়া মোড়া গঠন সৌন্দর্যে বেশ আকর্ষণীয়। বাঁশের চৌকো ও গোল ফ্রেমও বেশ চমক দেয়।

বাঁশ-বেতের কাজে মূল সৌন্দর্যের উৎস লুকিয়ে থাকে শিল্পীর ভাবনায়। আর তার প্রকাশ ঘটে বুননি ও মেলাইয়ের দক্ষতায়। মাঝে মাঝে জলে ছেঁটা মেরে মেরে বাঁশ ও বেতকে নরম করে নেওয়া। চতুর্থ আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণে এক-দুই-তিন করে গেঁথে ফেলা। বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া। অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় চর্চিত জ্ঞান নিয়ে সেজে ওঠে বাঁশ-বেত শিল্প। বাঁশ অপেক্ষা বেত নমনীয়, তাই সহজে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সরু বেতকে নানা আকৃতি দেওয়া যায়। প্রথমে বেতকে কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রেখে তুলে নিয়ে সোজা করতে হয়। আঁতি-গিঁট চেঁচে ফেলার পর ধারালো কিছু দিয়ে প্রয়োজন মতো চেরা হয়। ফসল মাপার জন্য বেতের জিনিস গুরুত্ব পেয়েছে। তাল কাঠ ও পিতলের পাশাপাশি বেত দিয়ে তৈরি হয় পাই-কুনকে। দাড়িপাল্লাও হতো বেত দিয়ে। লক্ষ্মীর হাঁড়ি, ফুলের সাজি, জল পাত্রের ঢাকনা ঝুম, ছাম্মা বাক্স, ট্রে, ব্যাগ, চটি এ সবই সরু বেতের তৈরি। মোটা বেত দিয়ে তৈরি হয় মোড়া, বড় আকৃতির পাত্র, মাছ-চরকি এরকম নানা অলঙ্করণে সাজানো পালকি আকৃতির বিয়ের সৌখিন ডালা। জুঙ্গুর ছাতাও বেশ আকর্ষণীয়। বেশি মোটা বেত দিয়ে তৈরি বয় দোলনা, হাত-লাঠি, ছাতার বাঁট, ইজি-চেয়ার। শীতল পাটির শীতল ছোঁয়াতো আছেই। বলাবাহুল্য শীতল পাটি তৈরি হয় মুত্রা বেত দিয়ে। শীতলপাটি তৈরিতে কোচবিহারের ঘুঘুমারি, ফুসনাডাঙ্গা, ধুনিয়াবাড়ির শিল্পীরা দক্ষতা দেখিয়েছে। ধারালো কিছু দিতে মুত্রা বেত কেটে কয়েক ফালিতে চিরে ফেলা হয়। তারপর লেগে থাকা ভেতর দিকের নরম অংশটি চেঁচে ফেলে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ওপরের অংশটি একটু চেঁচে নিলে বেরিয়ে আসে বাদামি রঙ। শীতলপাটি বোনার উপযোগী হলো নরম কোষের উন্নতমানের মুত্রা বেতের ছাল; আর কম উন্নতমানের অংশগুলি দিয়ে বোনা হয় বুকা পাটি। বলা বাহুল্য, মুত্রা বেতের ছাল বারো ঘণ্টারও বেশি সময় ডুবিয়ে রাখা হয় জমানো টকে যাওয়া ভাতের ফ্যানে। এর সঙ্গে টক দই মিশিয়ে সিদ্ধ করলে বেত সাদা-মসৃণ হয়। প্রয়োজনে রঙিন করতে সিদ্ধ করার সময় রঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ধুয়ে শুকিয়ে বেতকে পাটি তৈরির উপযোগী করে দেওয়া হয়। দু' হাত দিয়ে দুটো রেখে দুটো ধরে চলে বুনন কাজ। তেরছা ভাবে এক-দো অথবা তে ধারা পদ্ধতিতে বুনন শুরু হয়। বর্তমানে শীতলপাটি দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাগ, জুতো, টেবিলের ঢাকনা, গহনায় রঙিন সুতোর পরিবর্তে পাটির বাঁধন। মেয়ের বাড়ির তত্ত্বে পাঠানো চিত্র নকশাতে সাজানো শীতলপাটির প্রয়োজনীয়তা হারাতে বসেছে। বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি মাছ, কচ্ছপ, ফুলদানি, টব রাখার উঁচু থাম, টেবিল ল্যাম্প, হ্যাজাক লাইট, বাল্বের ছাতা শেড, ঘড়ির-বেল্ট, মেয়েদের মাথার ক্লিপ, পাখির বাসার মতো দোলনা এসব বেশ আকর্ষণীয়। আর কৃষি কাজে তো বাঁশ-বেতকে অবজ্ঞা করার উপায় নেই। গ্রাম্য কৃষি সংস্কৃতিতে বাঁশ-বেত শিল্পের চাহিদা সম্পূর্ণ রূপে প্রয়োজন কেন্দ্রিক। শহরে ওই শিল্পগুলি তেমন গুরুত্ব পায় না। শিল্প দ্রব্যগুলির দামও কম। ভালো দাম পাওয়ার আশায় শহুরে সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে বাঁশ-বেত নানা ভাবে সেজে উঠছে। আধুনিক প্রযুক্তির এবং শিল্পদ্রব্যের কাছে বাঁশ বেত গুরুত্ব হারাতে বসেছে। মেদিনীপুরের বনবাসীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অস্থায়ী ডেরা বেঁধে গ্রামের পরিবারগুলির চাহিদা মতো বাঁশ বেতের জিনিস তৈরি করে দিতো। ■

সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের মা চণ্ডী

শুভদীপ রায়চৌধুরী

১৬০৮ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের থেকে ৮টি পরগনার নিষ্কর জমিদারি পেয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গে রায়, চৌধুরী এবং মজুমদার উপাধি। সেই জমিদারির বিস্তৃতি ছিল উত্তরে হালিশহর থেকে দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত। ১৬১০ সালে কলকাতার প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেন সাবর্ণ গোত্রীয় লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী বড়িশার আটচালায়। কারণ বড়িশা তখন উন্নত জনপদ। পরিবারে দুর্গাপুজো, অন্নপূর্ণাপুজো, কালীপুজো, দোল, রাস এছাড়াও উল্লেখযোগ্য হলো— চণ্ডী পূজা। সাবর্ণ গোত্রীয় মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী (৩০তম বংশতিলক) প্রতিষ্ঠা করেন মা চণ্ডীকে ১৭৯২ সালে। সেই চণ্ডীপুজো নিয়েও এক ঐতিহ্যময় ইতিহাস রয়েছে। মহেশচন্দ্র ধার্মিক ছিলেন এবং প্রতিদিন বাড়ির প্রতিষ্ঠিত পুকুরে স্নান করতে যেতেন। একদিন পুকুরে স্নান করতে গিয়ে মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী লাভ করলেন এক অষ্টধাতুর কলসী। সেই অষ্টধাতুর কলসীটি বাড়ির উঠোনে রেখেছিলেন। তিনদিন বাদে রাত্রে দেবীর দর্শন পান। দেবী নির্দেশ দেন— ‘‘আমাকে পেলি, পুজো করবি না! আমাকে তোর গৃহতেই প্রতিষ্ঠা কর।’’ মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী তখন ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সমস্ত কাহিনি বর্ণনা করায় পণ্ডিতরা পুঁথি দেখে বলেন ইনি মা চণ্ডী। মহেশচন্দ্র তাঁর ভবনে মা চণ্ডীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দুর্গাপুজোর পঞ্চমীর দিন। তাই দুর্গাপঞ্চমীতিথিকে মায়ের জন্মতিথি হিসাবে পালন করা হয়। মহেশচন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী মায়ের বার্ষিক পূজার জন্য বাড়ির সামনেই এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরীর সময় এই পুজো সমৃদ্ধ লাভ করে এবং সেখানেই মায়ের বছরে একবার মূর্তি এনে পূজা করা হয়। আর মহেশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মা চণ্ডীর সারাবছরই নিত্যপূজা হয় অষ্টধাতুর কলসীতে মহেশভবনে। কালীঘাটের সঙ্গে যেমন সাবর্ণ পরিবারের ১৫৬৯ সাল থেকে সম্পর্ক, তেমনই বড়িশা তথা বঙ্গের এক উল্লেখযোগ্য উৎসব চণ্ডীপূজা। এই চণ্ডীপূজাকে কেন্দ্র করে বিরাট মেলারও আয়োজন করা হয়। দেবী চণ্ডীকার প্রণাম মন্ত্র—



‘ওঁ বন্ধূক-কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্
স্ফুরচ্চন্দ্রকলা-রত্না-মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং
পুস্তকঞ্চাক্ষমালঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ।।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্।’

অর্থাৎ যিনি বন্ধূকপুষ্পবর্ণা ও শিবোপরি সংস্থিতা, উদীয়মান চন্দ্রকলা যাঁর মুকুটরত্নরূপে বিরাজিত, যিনি নর-মুণ্ড-মালা-শোভিতা ও উন্নত-ঘটবৎ-স্তনযুগলসংযুক্তা, যিনি ত্রিনয়না ও রক্তবসনা, যিনি চারহস্তে যথক্রমে পুস্তক ও রুদ্রাক্ষমালা এবং বরমুদ্রা ও অভয়ামুদ্রা ধারণ করেন।

পঞ্চমীর দিন মায়ের তন্ত্রমতে পূজা, হোম, পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে ভোগ নিবেদন করা হয়। এছাড়া অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতিথিতে মায়ের বার্ষিক পূজা হয়। চণ্ডীপুজোর অষ্টমীতে মায়ের রাজবেশ হয়। এছাড়া সেদিন বহু মানুষ মায়ের পুজো দেওয়ার জন্য আগেরদিন বিকেল থেকে অপেক্ষারত থাকেন, তাঁদের বিশ্বাস মা এখানে করুণাময়ীরূপে বিরাজ করছেন।

চণ্ডীপুজোর দিন মায়ের বিশেষ ভোগ হয়। ভোগে থাকে— সাদাভাত, খিচুড়ি, পোলাও, সাতরকমের ভাজা, তিনরকমের তরকারি, মাছ, চাটনি, পায়েস ইত্যাদি। সেই পুণ্যতিথিতে মায়ের সারাদিন পূজাপাঠ হয়। এই চণ্ডীপুজো আজ প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন। সাবর্ণ পরিবারের মহেশভবনে আজও দেবীর প্রাচীন অষ্টধাতুর কলসী জাগ্রতরূপে বিরাজ করছেন। সেই প্রাচীন রীতি মেনেই আজও মহেশভবনে দেবীর পূজা হয়ে থাকে।

(লেখক সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের ৩৬তম বংশধর)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER CO.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone: +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email: pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর



BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796



কী লজ্জা! খুনির নামে শহর

কী লজ্জা! খুনির নামে শহর

নিশান্ত কুমার আজাদ

ইতিহাসের নিজস্ব কিছু স্ববিরোধিতা আছে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। যে হামলাবাজ মুসলমান ভারতে প্রবেশ করে অবাধ ধ্বংসলীলা এবং লুঠতরাজ চালিয়ে প্রাচীন মগধ সাম্রাজের একটা অংশকে টলিয়ে দিল, এখনও বিহারে তার নামে একটি শহর রয়েছে। শহরের রেলস্টেশনটির নামও তার নামে। হ্যাঁ, পাঠক, আপনি ঠিকই বুঝেছেন, আমি বক্তিয়ারপুরের কথাই বলছি।

কিছুদিন আগে বিহারে গিয়েছিলাম। দেখলাম রাজধানী পাটনা থেকে ৫০-৬০ কিলোমিটার দূরে বিহারের একটি জেলার নামও বক্তিয়ার খিলজি। এ নাম সেই নিষ্ঠুর খুনির, সে শুধু হাজার হাজার মানুষকেই খুন করেনি, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ধ্বংস করেছিল।

সব থেকে বিরক্তিকর ব্যাপার হলো, যদি কেউ নালন্দায় যেতে চান তাহলে তাকে বক্তিয়ারপুরে নেমে ট্রেন বদল করতে হবে। আমিও বক্তিয়ারপুরে নেমেই ট্রেন বদল করেছিলাম। এবং অবাক হয়েছিলাম ইতিহাসের এই অবিচারে।

তখন আমি মনের মধ্যে জড়ো হওয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে নাজেহাল। লক্ষ্য করলাম এক বৃদ্ধ জমিয়ে যুবকদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। বয়েস সত্তর পেরিয়েছে বলে মনে হলো। যুবকেরা তাকে 'গান্ধীবাবা' বলে সম্বোধন করছিল। অগত্যা আমি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার নাম বক্তিয়ারপুর কেন? বৃদ্ধ বললেন, 'ইয়ে নাম হামলোগোঁ কে উপর এক ধাব্বা হ্যায়। আজাদি কে সত্তর সাল হো চুকে হ্যায়, কয়ি সারে রোড কে নাম বদলে যা চুকে হ্যায়, লেকিন পতা নেহি কব বক্তিয়ারপুর কা নাম বদলে গা'।...অর্থাৎ এই নাম আমাদের সকলের কলঙ্ক। স্বাধীনতা পাওয়ার পর সত্তর বছর কেটে গেল। কত রাস্তার নাম বদলে গেল। জানি না বক্তিয়ারপুরের নাম কবে বদলাবে। তিনি আরও বলেন, 'বক্তিয়ারপুর নামটা খুবই পীড়াদায়ক। আমি রাজনৈতিক নেতাদের কাছে অনুরোধ করতে চাই, বক্তিয়ারপুরের নাম অবিলম্বে বদলে দেওয়া হোক। এমন কোনও নাম রাখা হোক যা এই শহর এবং এই অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে মানানসই।'

বক্তিয়ার খিলজি ছিল সুলতান কুতবুদ্দিন আইবকের সামরিক প্রধান। ১১৯৩ সালে খিলজি নালন্দা ধ্বংস করে। তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' ঐতিহাসিকদের দাবি, বক্তিয়ার খিলজিই বক্তিয়ারপুর শহরের পত্তন করেছিল। কিন্তু বক্তিয়ারপুরের সাধারণ মানুষ যারা খিলজিকে বহিরাগত হামলাবাজ হিসেবে দেখেন তাঁরা ঐতিহাসিকদের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন। তাঁরা মনে করেন এই ধরনের ভাবনা ঔপনিবেশিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা ঔপনিবেশিক যুগের কলঙ্ককে আর বয়ে বেড়াতে চান না।

খিলজির নিষ্ঠুরতা, বিশেষ করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন লাগানো সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। খুব বেশি মানুষ এর কথা জানেন না। একবার খিলজি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। দুঃখের বিষয় দরবারের চিকিৎসকদের কেউই তাকে সারিয়ে তুলতে

পারেনি। সেই সময় কেউ একজন তাকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রাহুল শ্রীভদ্রের কাছে যেতে বলে। এও বলে, শ্রীভদ্র তাকে নিশ্চয়ই সুস্থ করে তুলতে পারবেন।

ইসলামিক সংস্কৃতির ওপর খিলজির ছিল অগাধ আস্থা। মুসলমান নন, এমন কোনও চিকিৎসকের কাছে নিজের চিকিৎসা করাতে সে আদৌ রাজি ছিল না। কিন্তু সেবার খিলজির অবস্থা কিছুদিনের মধ্যে আরও করুণ হয়ে দাঁড়াল। শ্রীভদ্রের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায়ই রইল না। তবে খিলজিও শর্ত দিল, তাকে সুস্থ করতে হবে ওষুধ ছাড়া।

ভারতীয়রা তার দরবারের চিকিৎসকদের তুলনায় সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, এই বোধ খিলজিকে উন্মত্ত করে তোলে। সে ঠিক করে, ভারতীয়দের অপরিমিত জ্ঞানের মূলস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম এবং আয়ুর্বেদ— দুটোকেই সে এদেশের মাটি থেকে উপড়ে ফেলবে। তারপরই সে নালন্দায় আগুন লাগায়। ৯০ লক্ষ পুঁথি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুরু হয় নির্বিচারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং ছাত্র-গবেষকদের হত্যাপর্ব। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ সারা বিশ্বের ইতিহাসে বর্বরতম ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত। এর প্রধান কারণ খিলজি আগুন লাগিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। কেউ কেউ বলেন সমগ্র গ্রন্থাগারটি পুড়ে ছাই হতে সাড়ে ছ'মাস সময় লেগেছিল।

২০০৬ সাল। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব তখন রেলমন্ত্রী। তিনিই প্রথম বক্তিয়ারপুর স্টেশনের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। ২০১৫ সালে টেলিগ্রাফ পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। জানা যায় গোপাল প্রসাদ নামে এক ব্যক্তি তথ্য জানার অধিকার আইনে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলার নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৩০ মার্চ ২০০৬ রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল বুটা সিংহ এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিংহ হুডার ব্যক্তিগত মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকে চিঠি লেখেন। বলা বাহুল্য, দু'জনেই বক্তিয়ারপুর স্টেশনের নাম বদল করে স্বাধীনতা সংগ্রামী শীলভদ্র ইয়াজের নামে রাখার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। লালুরও তাতে অমত ছিল না।

লালু চিঠিতে লেখেন, 'যেহেতু রেলস্টেশনের নাম পরিবর্তন করা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক্তিয়ারভুক্ত, তাই নাম পরিবর্তনের বিষয় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।' জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক লেখে, 'বক্তিয়ারপুর রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে শীলভদ্র ইয়াজে নগর রাখার জন্য বিহার সরকারের একটি প্রস্তাব আমরা রেলমন্ত্রক মারফত পেয়েছি। অতিরিক্ত কিছু তথ্য এ ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজন। বিহার সরকারকে জানানো সত্ত্বেও তারা এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।'

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপির প্রবীণ নেতা গিরিরাজ সিংহও বক্তিয়ারপুর ও আকবরপুরের নাম বদলের দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'আর কতদিন আমরা বিদেশি আক্রমণকারীদের দেওয়া নাম বহাল রাখব?' বক্তিয়ারপুরের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করে তিনি বলেন, 'এলাহাবাদের নাম বদল করে ওই শহরের প্রকৃত নাম প্রয়াগরাজ রাখার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ। যখন আপনি তুলনামূলক ভাবে দুর্বল তখন যদি কেউ আপনার বাড়ির দখল নেয়— শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর আপনি কি নিজের বাড়ি উদ্ধারের চেষ্টা করবেন না? সারা দেশে এরকম অসংখ্য জায়গা আছে যেখানকার নাম এখনই বদল করা দরকার। বক্তিয়ারপুর থেকেই সেটা শুরু হতে পারে।'

গিরিরাজ সিংহ এই দাবি করার পর যথারীতি শুরু হয়েছে বিতর্ক। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বিধায়ক এবং মুখপাত্র ভাই বীরেন্দ্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, 'উনি কি ওঁর বাবা-মার নাম বদল করতে পারবেন? মুঘল এবং অন্যান্য হামলাকারীদের নামে মেরুকরণের চেষ্টা সফল হবে না।' বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং হিন্দুস্থানী আওয়াম মোর্চার নেতা জিতনরাম মাঝিও গিরিরাজ সিংহের বক্তব্যের সমালোচনা করেন। এখন প্রশ্ন হলো, বক্তিয়ারপুর রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তনের দাবি প্রথম উত্থাপন করেছিলেন স্বয়ং লালুপ্রসাদ যাদব। তাহলে তাঁর দল এবং দলের নেতারা কেন এখন প্রতিবাদ করছেন?

স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে তাঁরা বক্তিয়ারপুর শহর এবং রেল স্টেশনের নাম পরিবর্তন করতে চান। এমনকী বেশ কয়েকবার তারা নাম বদলের দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। স্থানীয় যুবক অভয় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা নাম বদল করবার জন্য লড়াই করছি। আমি নিজেই তো দু'দশক ধরে

জগজ্জননী মা সারদা জন্মোৎসব সমিতির
চেতনা সম্মেলন

শোভাযাত্রা আরম্ভ—স্থান : স্বামী বিবেকানন্দের বসত বাড়ি
দিনাঙ্ক : ২৯ ডিসেম্বর, শনিবার, ২০১৮
সময় : সকাল ১১-টায়
(আরম্ভের ৩০ মিনিট পূর্বে সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য)
সমাপ্তি স্থান : বাগবাজারস্থিত মায়ের বাড়ি।
সম্মেলন : সময় দুপুর ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ : ৮৯৬৭০২৭০২৭, ৯৩৩৯৮১৭৩৫৫, ৯০০৭৫০৯২১৫

সমস্ত মা-বোনের উপস্থিতি কাম্য





কলঙ্কিত নাম পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ।

এই লড়াইয়ের অংশীদার। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকুমারের পিতৃপুরুষের গ্রাম কল্যাণ রিঘা বক্তিয়ারপুরেরই অন্তর্গত। আমার ধারণা, এখানকার সাধারণ মানুষের মতো উনিও একজন খুনির নামাঙ্কিত জেলার বাসিন্দা হবার লজ্জা ভোগ করেন।' অভয় আরও বলেন, 'আমরা অনৈতিক দাবি করছি না। এটা আমাদের অধিকার। কেউ যখন আমাদের বক্তিয়ারপুরবাসী বলে, লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়।' কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এলাহাবাদের নাম পরিবর্তন করে প্রয়াগরাজ রেখেছেন। সেই প্রসঙ্গে অভয় বলেন, 'এলাহাবাদের নাম বদলের পর এখানকার আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেড়েছে। এর আগে যখন মুঘলসরাই স্টেশনের নাম বদল করে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন রাখা হয়েছিল তখনও এখনকার মানুষ বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।'

যদিও বক্তিয়ারপুরের নাম বদল করে নতুন নাম কী রাখা হবে, সে ব্যাপারে এখানকার মানুষ এখনও ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'নতুন নাম কী হতে পারে?' —তাহলে একাধিক উত্তর পাওয়া যায়। কেউ বলেন, নতুন নাম হোক নাগার্জুননগর। বক্তিয়ারের হাতে নালন্দা ধ্বংস হবার আগে নাগার্জুন ছিলেন সেখানকার শিক্ষক। আবার কেউ বলেন, নতুন নাম হোক শীলভদ্র ইয়াজে নগর। স্বাধীনতা সংগ্রামী শীলভদ্র ইয়াজে বক্তিয়ারপুরে থাকতেন। জনশ্রুতি, শীলভদ্র ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহচর। ব্রিটিশ সরকার তার ওপর বহুবার অকথ্য অত্যাচার চালায়। বক্তিয়ারপুরের নাম শীলভদ্র ইয়াজের নামে রাখার প্রস্তাবে লালুপ্রসাদও রাজি। কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ মানুষ যে নামটি পছন্দ করেন, সেটি হলো মগধদ্বার।

নুনুবতী জগদেব সিংহ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এবং বক্তিয়ারপুরের অধিবাসী সুরেশ দ্বিবেদীও মগধদ্বার নাম রাখার পক্ষপাতী। তাঁর প্রশ্ন, 'আপনি কীভাবে একটা শহরের নাম একজন খুনির নামে রাখতে পারেন?' এই বিষয়ে তাঁর অভিমত, কোনও শহরের নাম তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বিচার করে রাখা হয়। কেউ নিশ্চয়ই বিদেশি লুটেরা এবং খুনিদের নামে কোনও শহরের নাম রাখে না। কিংবা তাদের দেওয়া নামও এত বছর ধরে বহাল রাখে না। তিনি বলেন, 'একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দেশীয় সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের গর্ব করা উচিত। সরকারেরও উচিত এখানকার ভূমিপুত্রদের ভাবনার কদর করা। এটা ঠিক, অনেক রাজনৈতিক দলই নাম বদলে আগ্রহী নয়। কিন্তু যদি সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে নাম বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে সেটা আখেরে ভালোই হবে।'

কোনও জায়গার নাম বদল নতুন কোনও ঘটনা নয়। আমাদের দেশে বহুবার এই ঘটনা ঘটেছে। এই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল বত্রিশ বছরের রামনরেশ ঝার মুখেও। বক্তিয়ারপুর স্টেশনে তিনি ট্রেন ধরার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। কথায় কথায় বললেন, 'মানুষ তো এই প্রথম কোনও শহরের নাম বদল করার কথা বলছেন না, সরকারও এই প্রথম এরকম দাবির সম্মুখীন হচ্ছে না। সব দশকেই নাম বদলের ঘটনা ঘটেছে। এমনকী ব্রিটিশ ভারতেও ইংরেজরা যেসব সংস্কৃত নাম উচ্চারণ করতে পারত না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বদলে দিয়েছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'যেসব রাজনৈতিক দল এর মধ্যে তোষণের গন্ধ খুঁজছে, মনে রাখা উচিত তাদের আমলেও নাম বদলের ঘটনা ঘটেছে।'

ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে ঔপনিবেশিক ভারতের স্মৃতি এভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস কখনওই সমর্থযোগ্য নয়। বিশেষ করে যে স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ধ্বংস হত্যা আর লুণ্ঠন। মনে রাখা দরকার, মানুষের মনকে ঔপনিবেশিকতার স্পর্শ মুক্ত করতে হলে আগে প্রতিটি গ্রাম-শহরের নাম থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে। সম্প্রতি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। প্রয়াগ তার প্রকৃত নাম ফিরে পেয়েছে। বক্তিয়ারপুরের নামও বদল করা উচিত। এখানকার নাম হওয়া উচিত মগধদ্বার।

(সৌজন্য অর্গানাইজার)

সাধু রামচাঁদ মুর্মু

সাঁওতালি সাহিত্যের বিকাশে সাধু রামচাঁদ মুর্মুর অবদান অনস্বীকার্য। সাঁওতাল সমাজে তিনি সাঁওতালি ভাষার মহাকবি হিসেবে স্বীকৃত। আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি অসংখ্য গান, কবিতা রচনা করে সাঁওতালি সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করে গেছেন । সেসবের মধ্যে তাঁর দেশপ্রেম ও সমাজ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

যে সময়ে সাঁওতালরা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিলেন সে সময়ে রামচাঁদ মুর্মু সবাইকে সচেতন হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছেন। তিনি গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন। সেসব গান আজও হাটে-বাজারে, মেলায়, পূজাপ্রাঙ্গণে শোনা যায়। বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বনবাসী মানুষদের একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লড়াই করে বাঁচার একমাত্র পথের সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন। তাই তাঁর নাম সাঁওতাল সমাজে সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

সাধু রামচাঁদ মুর্মু বাংলা ১৩০৩ সালের ১৬ই বৈশাখ মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার কামারবান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহন মুর্মু এবং মাতা কুনি মুর্মু। আট বছর বয়সে তিনি গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। তারপর তিনি ভীমপুর মিশন স্কুলে পড়তে যান এবং সেখান থেকে মধ্য বাংলা পাশ করেন। ভীমপুর মিশন স্কুলে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম হাতের কাজ যেমন—



কাঠ মিস্ত্রির কাজ, তাঁতের কাজ তাঁকে শিখতে হয়। পরবর্তী জীবনে সেগুলি তাঁর কাজে আসে। বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় তাঁর আর উচ্চশিক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি বাড়ি ফিরে আর পাঁচজনের মতো চাষ-আবাদ করে জীবনযাত্রা শুরু করেন। কিন্তু সে জীবন তাঁর ভালো লাগেনি। তিনি সমাজ সংস্কারে মন দেন এবং কিছু দিনের জন্য সন্ন্যাসব্রত নেন। তাঁর সরল সাদাসিধে জীবন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে তিনি সাধু আখ্যা পান।

মা-বাবার মৃত্যুর পর তাঁকে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তাসত্ত্বেও তিনি সমাজ সংস্কার ও সাহিত্য সাধনা থেকে বিরত হননি। খাওয়া-পরার কথা চিন্তা না করে মন-প্রাণ দিয়ে সাহিত্য চর্চা করে যান। সাহিত্যের বিকাশে জাতির বিকাশ। তাই তিনি ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে আজীবন সাহিত্য সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তাঁর লেখা গান ' দেবোন তেঙ্গেন আদিবাসীবীর'(এসো দাঁড়াই আদিবাসী বীর) আজ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও অসমের সাঁওতালদের মুখে মুখে শুনতে পাওয়া যায়। সমাজ ও জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল বলেই তিনি এধরনের গান রচনা করে গেছেন। গানটি এখন সাঁওতাল সমাজের কাছে জাতীয় সংগীতের সম মর্যাদায় গণ্য হয়।

তাঁর সমস্ত কবিতাই ছন্দভিত্তিক। পয়ার ছন্দই বেশি। ভাষা ও ছন্দের এত সুন্দর মিল আর কোনও সাঁওতাল কবির কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন সাঁওতালি ভাষার লিপি না থাকায় সাধু রামচাঁদ লিপি আবিষ্কার করে গেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত লিপির নাম 'মর্জ দাঁদের আঁক'। এই লিপিতে তিনি সারি ধরম(শাশ্বত ধর্ম) গ্রন্থখানি রচনা করেন। সাধু রামচাঁদের বহু রচনা আজও অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়ে আছে। বাংলা ১৩৬৯ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ সাঁওতাল সমাজের এই মহান কবি পরলোকগমন করেন।

(পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

ভারতের পথে পথে

শ্রবণবেলগেলা



সুপ্রাচীনকাল থেকে ৯৩০ মিটার উঁচু কর্ণাটকের জৈনতীর্থ শ্রবণবেলগোলার প্রশস্তি। পাহাড় চূড়ায় অপার্থিব রাজকীয় ঐশ্বর্য ও মহিমা নিয়ে গ্রানাইট পাথরে নির্মিত মনোলিথিক মূর্তি গোমতেশ্বর বা বাহুবলীর। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে ৯৩০ মিটার উঁচু ইন্দ্রগিরির চুড়ো কুঁদে তৈরি হয়েছে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের পুত্র ভগবান বাহুবলী অর্থাৎ পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান গোমতেশ্বর দিগম্বর মূর্তি। ঋজু ভঙ্গিমায় আত্মসংযমের চূড়ান্ত প্রকাশ। প্রতি বারো বছর অন্তর মস্তকাভিষেক উৎসব হয়। এসময় গোমতেশ্বর মূর্তিকে তখন ঘি, দুধ, নারকেলের দুধ দই, মধু, সিঁদুর, চন্দন,রৌপ, ও স্বর্ণমুদ্রা, মণিমুক্তো এবং ১০০৬ ঘড়া পবিত্র জলে স্নান করানো হয়। ১৩৯৮ থেকে হয়ে আসছে এই উৎসব। উৎসবকালে দূরদূরান্ত থেকে জৈনরা আসেন। আসেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা।

জানো কি?

- ধননন্দ মগধ সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন।
- ধননন্দের মহামাত্য রাক্ষসের প্রকৃত নাম কাত্যায়ন।
- গ্রিকবীর আলেকজান্ডার পুরুর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।
- আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত আচার্য চণকের পুত্র ছিলেন।
- আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।
- চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিষ্ণুগুপ্তের সাক্ষাৎ হয় পাটলিপুত্রে।
- চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি বংশের ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ভালো কথা

রনির বাবার ফুলের বাগান

রনির বাবা ফুল খুব ভালোবাসেন। এই শীতের মরশুমে ওদের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটা ওর বাবা চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া ও নানা রকমের গাঁদাফুলের গাছে ভরিয়ে তোলেন। বাড়িতে কেউ এলে রনির বাবা খুব ভয়ে ভয়ে থাকেন। পাছে কেউ গাছ থেকে ফুল তোলেন। গাছ থেকে ফুল তোলা রনির বাবা একদম পছন্দ করেন না। এবারেও রনিদের বাড়ি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। সেদিন ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি সব গাছে একটা করে প্ল্যাকার্ড। তাতে কোনোটায় লেখা ' ফুল তুলিয়া সৌন্দর্যহানি করিবেন না', কোনোটায় ' মায়ের কোল থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিবেন না', কোনোটায় ' গাছেই আমি বালো থাকি, আপনার হাতে নয়' ইত্যাদি। রনির বাবা আমাকে বললেন, জানিস, এবারে কেউ ফুলে হাত দেয়নি। আমি বললাম, জেঠু তোমার বুদ্ধি তো দারুণ!

মধুমিতা বসাক, একাদশ শ্রেণী, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) য় অ তী ক্ষ য়া	(১) ন্ন ন জ্ঞা স ম্প অ র ক্ষ
(২) ষ বি ই র শে	(২) ম্ য় তী দ্বি বা ক মে এ

১০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) মঙ্গলদীপ (২) রাজাধিরাজ

১০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) হৃদয়বিদারক (২) বসন্তসমাগম

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (২) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (৩) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। (৪) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।।২।।

মৃগয়ায় গিয়ে এক হরিণের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে পরীক্ষিৎ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে এক তপস্বী ঋষির আশ্রমে পৌঁছান। রাজা জানতেন না যে ঋষি মৌনী।







নিবেদিতার রচনায় শ্রীশ্রীমা সারদা

সুতপা বসাক ভড়

ভগিনী নিবেদিতা, 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে শ্রীমা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তারই কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

''অদ্ভুত এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলাম। আমাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যিনি কর্ত্রী— তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তাঁর জীবনের ইতিহাস সর্ববিদিত। পাঁচ বছর বয়সে পরিণয়, আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে স্বামীর বিস্মরণ, তারপরে মায়ের অনুমতি নিয়ে গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামী সমীপে গমন, বিবাহবন্ধনের কথা স্বামীর স্মরণে আসা, কিন্তু যে জীবন বরণ করেছেন, তারই আদর্শের কথা পত্নীকে শোনানো। উত্তরে, ওই জীবনপথের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনা করে স্বামীকে গুরুরূপে বরণ করে পত্নী কর্তৃক শিক্ষা প্রার্থনা— এ সমস্ত কথাই বহু কথিত। তারপর থেকে তিনি বহু বছর পরম আনুগত্যের সঙ্গে স্বামীর কাছে বাস করেছেন, দক্ষিণেশ্বরের বাগানেরই একটি কক্ষে থাকতেন,— একই সঙ্গে সহধর্মিণী ও সন্ন্যাসিনী এবং শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিষ্যা। তরুণ বয়সেই শিক্ষার সূচনা হয়েছিল।"

..."অথচ মায়ের চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, আরাধ্য স্বামীর বিষয়ে কথা বলবার সময়ে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের আভাস কখনো ফোটে না। স্বামীর প্রতিটি কথাকে সফল করবার জন্য তিনি সর্বাবস্থায়, বিপদে বা সম্পদে সুমেরুবৎ অটল,— কিন্তু সেই স্বামীকে তিনি 'ঠাকুর' বা 'গুরুদেব' ছাড়া কিছু বলেন না, কখনো স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কসূচক আত্মগরিমাযুক্ত একটি কথাও তাঁকে বলতে শোনা যায়নি। তাঁকে জানে না এমন কারো পক্ষে তাঁর কথাবার্তা থেকে কোনওমতে অনুমান করা সম্ভব নয় যে, চারপাশের অন্য কারও থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর তাঁর দাবি অধিকতর বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর! শিষ্যার মধ্যে পত্নী হারিয়ে গেছে দীর্ঘদিন আগে, যদিও পত্নীর পরম বিশ্বস্ততাটুকু রয়ে গেছে। তথাপি, তাঁর প্রতি সকলের ভক্তির সীমা নেই, প্রতি ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায় যেমন দৃষ্টান্তরূপে বলা হয়, তাঁর সঙ্গে ট্রেনে- ভ্রমণকালে তিনি তলার বেঞ্চে থাকলে উপরের বাঙ্কে উঠবার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। তাঁর উপস্থিতিই যে একটা দিব্য ব্যাপার।"

..."সারদাদেবী ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী— এই কথাই সর্বসময় আমার মনে হয়েছে। কিন্তু তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, না নতুন আদর্শের প্রথম প্রকাশ? প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের সমন্বয় সরলতম নারীজীবনেও কীভাবে করা সম্ভবপর তাঁকে দেখলে তা বোঝা যায়। ...এক দীর্ঘ নীরব প্রার্থনার মতো তাঁর সমগ্র জীবন।"

''শ্রীমা পড়তে পারেন। রামায়ণ পাঠে অনেক সময় কাটে। কিন্তু লিখতে পারেন না। তবু মনে করার কারণ নেই তিনি অশিক্ষিতা নারী। সাংসারিক অথবা ধর্মীয় বিষয় পরিচালনায় দীর্ঘ কঠিন অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই শুধু, অধিকন্তু ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি দর্শনের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে মানবের পক্ষে সর্বোচ্চ-সম্ভব আত্মবিকাশের সৌভাগ্য তিনি পেয়েছেন। বিরাটের সঙ্গী ও সাক্ষী হবার মহিমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তে অসচেতনে বহন করেছেন। তার গরিমাকে পূর্ণোচ্চারিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, যখন তিনি যে কোনও নতুন ভাব বা অনুভূতির মর্মভেদ করেন অবিলম্বে, অব্যর্থভাবে।"

..."শ্রীমায়ের আবাসে দিনগুলি শান্তি ও মাধুর্যে ভরা। প্রত্যূষের অনেক আগেই সকলে একে একে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করে, বিছানা মাদুরের উপর থেকে চাদর ও বালিশ সরিয়ে, তার উপরে স্থির হয়ে বসেন, মুখ ঘোরানো থাকে দেওয়ালের দিকে, হাতে ঘুরতে থাকে জপের মালা। তারপরে ঘর পরিষ্কারের ও স্নানাদির সময় আসে। পর্বের দিনে শ্রীমা এক সঙ্গিনীর সঙ্গে পালকিতে গঙ্গাস্নানে যান। তার পূর্ব পর্যন্ত রামায়ণ পড়েন। তারপরে নিজের ঘরে মা পুজোয় বসেন। অল্পবয়সীরা প্রদীপ জ্বালায়, ধূপ-ধুনা দেয়, গঙ্গাজল, ফুল ও পূজার জোগাড় করে। এই সময়ে গোপালের মাও এসে নৈবেদ্য তৈরিতে সাহায্য করেন। তারপর দুপুরের আহার ও বিকালের বিশ্রাম; সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ঝি লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের বাক্যালাপের মধ্যে; সকলে উঠে পড়ে; পট বা বিগ্রহের সামনে আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, গোপালের মা ও শ্রীমায়ের পদধূলি নিই, কিংবা বাধ্য মেয়ের মতো সঙ্গে ছাতে উঠে গিয়ে, তুলসীতলায় যেখানে প্রদীপ দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়ে বসি, বহুভাগ্য তার যে মায়ের পাশে তাঁর সান্ধ্য ধ্যানের সময়ে বসবার অনুমতি পায়,— মায়ের সব পূজার শুরু ও শেষ যে গুরু প্রণামে, সেই প্রণাম করতে শেখে স্বয়ং মায়ের কাছ থেকে!"



সহায়সম্বলহীনের অন্নদাতা

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গরিব মানুষের জীবনে খিদে কখনও কখনও শত্রু হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যেসব সহায়সম্বলহীন মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তাঁদের ক্ষেত্রে এ কথা আরও বেশি করে সত্যি। চিকিৎসার খরচ তো আছেই, সেইসঙ্গে রয়েছে রোগীর খাওয়া-দাওয়ার খরচ। দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীর বাড়ির লোকেদেরও দিনের পর দিন হাসপাতালে থাকতে হয়। তাদেরও খাওয়া দাওয়ার একটা খরচ আছে। সব মিলিয়ে বেশ করুণ অবস্থা। এই পরিপ্রেক্ষিতে পি.ইউ. টমাসের নামটা স্মরণযোগ্য। কারণ আজ থেকে কয়েক দশক আগে তিনি এই মানুষগুলোকে মর্যাদাসম্পন্ন জীবন উপহার দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। এবং এখনও তার জীবনযাপন এই মানুষগুলোকে নিয়ে।

সত্তর ছুঁই ছুঁই মানুষটির দিন কাটে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে। বস্তুত এক কাপ চা খাওয়ারও সময় থাকে না। তাঁর দিন শুরু হয় নিজের প্রতিষ্ঠিত নবজীবন ট্রাস্টের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে। এই আলাপচারিতার পর প্রায় দ্বিশতাধিক মানুষ আসেন তার সঙ্গে দেখা করতে। শীত গ্রীষ্ম বারোমাস এই নিয়মের নড়চড় হয় না। টমাস তাদের সঙ্গে ইতিবাচক কথাবার্তা বলেন। অনুপ্রেরণা দেন, সাহস জোগান। এরপর শুরু হয় আসল কাজ। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন হাসপাতালের রোগী এবং তাদের বাড়ির লোকের জন্য রোজ তৈরি করতে হয় বাড়িতে তৈরি খাবারের পাঁচ হাজার প্যাকেট। এরপর শুরু হয় চা তৈরি এবং রাতের খাবার তৈরির কাজ। বলা বাহুল্য, এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞে হাত লাগান টমাসও।

কবে থেকে শুরু হলো টমাসের এই সেবাকাজ? কেনই বা হলো? পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। একবার টমাসের পেপটিক আলসার ধরা পড়ল। সেবার ২২ দিন টমাসকে কোট্টায়মের সরকারি হাসপাতালে অবর্ণনীয় দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হাতে টাকাপয়সা না থাকায় কষ্ট আরও বেড়েছিল। হাসপাতালে থাকার সময়েই তিনি লক্ষ্য করেন অধিকাংশ রোগীই একবেলার খাবার জোটাতে পারেন না। এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে ১৯ বছরের টমাস রীতিমতো মুষড়ে পড়েছিলেন।

কুড়ি বছর বয়েসে টমাস কোট্টায়াম মেডিকেল কলেজের বয়েজ হস্টেলে একটা চাকরি পান। তখনকার দিনে বেতন ছিল একশো একান্ন টাকা। জীবনের প্রথম বেতন পাবার পর থেকেই তিনি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন গরিব দুঃস্থ রোগীদের ওষুধ কেনার জন্য প্রত্যেক মাসে পাঁচ টাকা করে খরচ করতেন। এছাড়া তিনি প্রতিদিন দুটি খাবারের প্যাকেট কিনতেন। একটি তার নিজের জন্য, অন্যটি কোনও গরিব রোগীর জন্য।

কিছুদিন পর এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। টমাসের সেবাকাজ দেখে বয়েজ হস্টেলে বসবাসকারী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা এগিয়ে এলেন। তারা যে শুধু টমাসকে অর্থসাহায্য করা শুরু করলেন, তাই নয়, আশেপাশের হোটেল থেকে খাবার সংগ্রহ করেও সাহায্য করলেন। এর কয়েক বছর পর টমাসের পদোন্নতি ঘটল। তিনি মেডিক্যাল কলেজের অ্যাটেনড্যান্ট নিযুক্ত হলেন। যার ফলে তাঁর সঙ্গে ডাক্তার এবং রোগীদের যোগাযোগ আরও বেড়ে গেল। তার সেবার কথা যতই লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ছিল, কোট্টায়াম এবং তার আশেপাশের বহু মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। নবজীবন ট্রাস্টের ভিতও রচনা হচ্ছিল একটু একটু করে।

ট্রাস্টের অন্যতম প্রধান কাজ গৃহহীন এবং মানসিক প্রতিবন্ধী রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের নবজীবন ভবনে নিয়ে আসেন এবং পরের দিনই তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ রোগীই কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে ওঠেন। তখন তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে, যদি কোনও কারণে বাড়ির লোক তাদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে তখন তারা হয়ে ওঠেন নবজীবনের স্বেচ্ছাসেবক। টমাস বলেন, 'পরিত্যক্ত মানসিক রোগীদের আত্মীয়স্বজনকে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। যদি খুঁজে বের করা যায় এবং যদি তারা রোগীকে ফিরিয়ে নিতে রাজি হন তহলে তার থেকে বেশি খুশির কিছু হয় না।'

এখন নবজীবনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় দ্বিশতাধিক মানুষ রয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৫ জন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষার মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হয় কিনা জানতে চাইলে টমাস বলেন, 'আমার কোনও অসুবিধে হয় না। কারণ ভালোবাসার থেকে হৃদয়স্পর্শী ভাষা আর কিছু নেই। এই ভাষায় কথা বলতে পারলে সকলেই তা বুঝতে পারে।' ■

হিন্দুরাষ্ট্র নেপালে গণতন্ত্রের নামে চলছে অবাধ ধর্মান্তরকরণ

ডাঃ আর এন দাস

হুগো স্যাভেজবাদ নেপাল হিমালয়ের পাদদেশে ভারত ও চীনের মধ্যে অবস্থিত ছোট্ট একটা দেশ। সারা বিশ্বের একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্রটি (২০০৬ সাল পর্যন্ত) ১ জুন ২০০১-এ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। ফল স্বরূপ রাজপরিবারের ৭ জন সদস্যের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর নায়ক ছিলেন স্বয়ং যুবরাজ দীপেন্দ্র। তিনি নিজেও নিহত হন সেই একই দিনে দেহরক্ষীদের গুলিতে। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জ্ঞানেন্দ্র সিংহাসনে বসেন, কিন্তু মাওবাদীদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ২০০৫ সালে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হন।

নেপালি কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ইউনিসেফ, খ্রিস্টান মিশনারি ও আরবের ইসলামি সংগঠনগুলির সঙ্গে সমঝোতা করে ২০০৬ সালে নেপালের সংবিধানে সেকুলার শব্দটি সংযোজন করে। ইন্দিরা গান্ধীও ১৯৭৬ সালে এমারজেন্সির সময় ভারতের সংবিধানে একই ভাবে সেকুলার শব্দটি সংযোজন করেন। এই একটি শব্দই হচ্ছে নেপাল বা ভারতের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশে ইসলাম বা খ্রিস্টান মতে ধর্মান্তরিত করার সহজ সরকারি লাইসেন্স! পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে হিন্দুর সংখ্যা কমার এটি একটি বড়ো কারণ। ২০০৮ সালে পাকাপাকি ভাবে কমিউনিস্ট সরকার নেপালে গণতান্ত্রিক দেশের তকমা সেঁটে দেয়।

খ্রিস্টান ও ইসলামিক সংগঠনগুলির সহযোগিতায় সহজেই কীভাবে একটা দেশের জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক মানচিত্রের আমূল পরিবর্তন করা যায়, এটা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সহজ, সাধারণ, ভালোমানুষ আপামর নেপালি জনতা মুক ও বধির হয়ে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। আজ ত্রিশ হাজারেরও বেশি নির্দোষ নেপালির জীবনের বিনিময়ে নেপালি কমিউনিস্টরা দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে চীনের দাসত্ব করতে প্রস্তুত হয়েছে। আমরা ভুলে যাইনি, কীভাবে চীনে মাওবাদ, রাশিয়ায় লেনিনবাদ, কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোবাদ, কম্বোডিয়ায় পল-পটবাদ এবং ভেনেজুয়েলায় চে গুয়েভেরাবাদ জনসাধারণের উপর একনায়কতন্ত্রের নির্দয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে ৭ কোটির বেশি নির্দোষ মানুষের প্রাণ হরণ করেছিল। মিজোরাম, নাগাল্যান্ড-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যেও তথাকথিত সেকুলারিজম এবং গণতন্ত্রের নাম নিয়ে ভারতের কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি কট্টর খ্রিস্টান ও ইসলামিক সংগঠনগুলির সাহায্য নিয়ে গত সাত-দশকের মধ্যেই দেশীয় উপজাতিগোষ্ঠী ও স্থানীয় হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন করে ধর্মান্তরণের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টানদের জন্য পৃথক দেশ বানানোর প্রক্রিয়া চালিয়েছিল এবং যা আজও অব্যাহত আছে। দক্ষিণ কোরিয়া আর এক জ্বলন্ত উদাহরণ। মাত্র অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই মিশনারিরা ১০০ শতাংশ বৌদ্ধ-ভিক্ষুর দেশকে ধর্মান্তরিত করে আমেরিকার উপনিবেশ ক্ষুদ্র এক খ্রিস্টান দেশ বানাতে সমর্থ হয়েছিল। এর জন্য আধুনিক অস্ত্র অথবা আণবিক বোমার প্রয়োজন হয়নি। বেসরকারি সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যা পেন্টাগনের অস্ত্রবিহীন সামরিক শক্তি হিসেবে পরিচিত। আজ নেপালের অবস্থাও সেইরকম। ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিসেই আছে কীভাবে 'আবেল' তার নিজের ভাইয়ের মাথা পাথর দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। 'ভাষার মধ্যে ভাষা, রাজ্যের মধ্যে রাজ্য, পরিবারের মধ্যে পরিবার সৃষ্টি করে, দুর্বল করে দিতে হবে প্রবল প্রতিপক্ষকে বিভেদের রাজনীতি ঢুকিয়ে' ('ওয়ার্ল্ড খ্রিস্টিয়ান ডাটাবেস' প্রকাশিত এবং 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট'-এর প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, সারা বিশ্বে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারে নেপালের নাম সর্বপ্রথমে রয়েছে। ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে হিন্দুরা এমনিতেই 'সফ্‌ট টার্গেট'।

নেপালে জনগণনার পরিসংখ্যান অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে এই দেশে একজনও খ্রিস্টান ছিল না। 'স্কন্দপুরাণে' বর্ণিত নে-মুনি বা নেমি-ঋষির প্রতিষ্ঠিত নেপালে শাক্য, লিচ্ছবি, কিরাত, শাহ প্রভৃতি হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করেছেন। শেষ জনপ্রিয় রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শা'র রামরাজত্বে, গো-ব্রাহ্মণের সেবা ছিল প্রতিটি হিন্দুর দৈনিক আচার অনুষ্ঠানের এক অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু তার পরবর্তী সময় থেকেই শুরু হয় নেপালের রাস্তা দিয়ে হিমালয় অভিযানের পর্ব। আর তার পরিণতি হয় বিদেশি পর্যটকের আনাগোনা। ১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা যায় মাত্র ৪৫৮ জন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নেপালি ছিল। কিন্তু তারপর থেকেই ক্রমবর্ধমান গতিতে বেড়ে চলেছে নেপালি খ্রিস্টানের জনসংখ্যা। 'নাগরিক' নামে নেপালি সংবাদপত্রের সম্পাদক বিশ্বমণি



ফাইল চিত্র

ফঃ ৬

পোখরেলের মতে, ২০০১ সালে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় এক লক্ষ দু' হাজার। আর সবশেষ, ২০১১ সালের জনগণনায় সেই সংখ্যা হয়ে যায় তিন লক্ষ সাতাশি হাজার। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই জনগণনার মধ্যে অনেক নেপালি খিস্টানের নাম তোলাই হয়নি। কারণ তাঁরা থাকেন অত্যন্ত দুর্গম প্রান্তে যেখানে জনগণনার কর্মীরা না পৌঁছাতে পারলেও ইউরোপিয়ান মিশনারিরা ঠিক সময় মতো বাইবেল, ক্রশ ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করে ফেলেন। যদিও সরকারি আইনে লেখা আছে, বেআইনি ভাবে প্রলোভন দেখিয়ে বা বলপ্রয়োগে কোনও নেপালি হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করলে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে, কিন্তু বাস্তবে তা কখনই হয় না। তাই অনিয়ন্ত্রিত গতিতে পোপের ভবিষ্যদ্‌বাণীকে সফল করতে আন্তর্জাতিক মিশনারি মেশিনারি অবিরত তাদের কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছে এবং তথাকথিত শাসকদলের পরোক্ষ সাহায্য নিয়েই এই ধর্মান্তরণের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে চলেছে।

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত নেপাল ছিল একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র, কিন্তু হিন্দুনামধারী দেশীয় বিধর্মীদের ষড়যন্ত্রের কারণে হিন্দুদের সেই গৌরব আজ ভূলুণ্ঠিত। অস্মিতাকে বিসর্জন দিয়ে কিছু ভ্রষ্টাচারী, লোভী, নৃশংস ও স্বার্থপর রাজনেতা চীনের মাওবাদকে আশ্রয় করে আপামর নেপালি জনতার চরম বিনাশের জন্য এক সর্বনাশা পথ বেছে নিয়েছে। পৃথিবীতে ভারত এবং নেপাল দু'টি মাত্র হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ কিন্তু তারা খ্রিস্টানদের কাছে 'হিদেনদের' দেশ আর ইসলামের চোখে 'দার-উল-হারব'। সুতরাং, আরব আর আমেরিকার পেট্রো-ডলারের দৌরাত্ম্যে হিন্দুরা তাদের অস্তিত্বকে কতদিন ধরে রাখতে পারবে, তা চিন্তার বিষয়! নেপালের 'তারাই' অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং পূর্ব-উত্তর প্রদেশের লাগোয়া বিস্তীর্ণ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা সেখানে নেকাপা (নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি) এবং নেপালের মুসলিম লিগ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। এবং সহজেই ক্ষমতাও দখল করে রয়েছে দীর্ঘদিন। ব্যাপক হারে ধর্মান্তরকরণের কারণে এবং বাংলাদেশি, পাকিস্তানি এমনকী রোহিঙ্গাদের অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে নেপালের 'তরাই' অঞ্চলের সমতল ভূভাগের জনবিন্যাস সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। এর জন্য দায়ী কে?

নেপালের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে যেখানে মঙ্গোলীয় জাতির (মগর, লিম্বু, রাই, গুরং) বাস, যারা হিন্দুদের মতোই অহিংস ও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, তাদেরকে টার্গেট করছে মিশনারিরা। 'হিদেন' আত্মার বেচা-কেনা হয় এখানে খুব সস্তায়। নেপালি মাত্র দশ হাজার টাকার বিনিময়ে পরিবারের পাঁচজন সদস্য এক ঘণ্টা মধ্যে পিটার, যোসেফ, সিন্ডি, লিসা ও লিজা হয়ে যায় গলায় 'ক্রসের' হার ঝুলিয়ে!

২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে, নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় ত্রাণকর্মীদের মধ্যে ইউরোপিয়ান মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য। মুমূর্ষু নেপালি হিন্দু-বৌদ্ধের অন্তিমকালে যিশুখ্রিস্টের নামে মুখে গুঁজে দেওয়া হতো শুকনো পাউরুটি ও লাল মদ, বাইবেল এবং ক্রসের মহিমা বর্ণনা করা হতো যাতে করে হিন্দু-'হিদেনের' আত্মা খ্রিস্টানদের-স্বর্গে সুখ ভোগ করতে পারে।

২০০৮ সালে, নেপালের রাজতন্ত্র শেষ হওয়া এবং নেপালি কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় 'সি ফর সি' (ক্লাইম্ব ফর ক্রাইস্ট) নামক নিউইয়র্ক-স্থিত রচেস্টারের মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের কারসাজি। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত প্রত্যন্ত গ্রাম 'ডোপচা' যাতে প্রথম মিশনারিদের তৈরি আধুনিক চার্চের প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেখতে দেখতে ২০১১ সালের মধ্যে ৫০০০ জনবসতি সম্পন্ন সম্পূর্ণ গ্রামটিই খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায় নির্বিবাদে, কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই। যেমন ভারতের তামিলনাড়ুতে, কর্ণাটকে এবং কেরলে নির্বিবাদে এবং অবশ্যই সরকারি সাহায্যে ও পরোক্ষ অনুদানে হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ অব্যাহত আছে এবং একের পর এক চার্চের প্রতিষ্ঠা আর হিন্দু মন্দিরের ধ্বংস সমান্তরালে চলছে বিশেষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে। ভেবে দেখুন 'চাচি ৪২০'-এর অভিনেতা কামাল হাসানের পার্টির কথা। প্রয়াতা মুখ্যমন্ত্রী জললিতা আর রুপালি পর্দার অভিনেত্রী জয়াপ্রদার কথা।

'সি ফর সি'-এর প্রতিষ্ঠাতা গ্যারি ফেলসনের কথায়, নেপালি হিন্দুদের মধ্যে জাতপাতের বিভেদ, দারিদ্র্য, রাস্তাঘাটের অসুবিধা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থা ইত্যাদি কারণেই নেপালি হিন্দুরা সহজেই ধর্মান্তরিত হয়ে যান। নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা লরেন লেভির মতে, 'অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস, বধূ-নির্যাতন, বরপণ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেশ ও বিদেশে লাভজনক পেশার প্রলোভন ইত্যাদির কারণেও নেপালে হিন্দুরা যারা বিশেষ করে সমাজের নিম্নবর্গের লোক, তাঁরা সহজেই ধর্মান্তরকরণ শিকারিদের ফাঁদে পড়েন'।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে এক বিরাট বিদ্রোহের সূচনা হয় যাতে বর্তমান সংবিধান থেকে 'সেকুলারিজম' শব্দ বাদ দিয়ে পুরানো হিন্দুরাষ্ট্রের দাবি জোরদার করা হয়। ২০১৪ সালে, কাঠমাণ্ডুস্থিত ব্রিটিশ রাজদূত আন্ড্রুউ স্পার্কের, 'নেপালি সংবিধানে ধর্মপরিবর্তনের অধিকারের মান্যতা দিতে হবে',উক্তিতে তৎকালীন সরকারকে নেপালি জনতার বিদ্রোহ দমনে মিলিটারির সাহায্য নিতে হয়েছিল।

ডোপচা গ্রামের পাদরি তেজ রোকার কথায়, 'আমরা সেই সব অতি দরিদ্র নেপালি হিন্দুদের কাছে যাই, যারা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দৈহিক ব্যাধিগ্রস্ত বা আইনগত সমস্যায় জর্জরিত। পীড়িতদের আমরা যীশু মসিহার বাণী শোনাই, নেপালি ভাষায় লিখিত বাইবেল উপহার দিই। বিনামূল্যে ওষুধপত্র, খাদ্যবস্ত্র দিই। পিতৃ-মাতৃহীন ছেলে-মেয়েদের অনাথালয়ে পাঠাই। অবিবাহিত নারীর গর্ভপাত করাই, দেশে-বিদেশে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিই। তাছাড়া দুর্গম গ্রামে কনভেন্ট স্কুল, রাস্তাঘাট, টয়লেট ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আমাদের ধর্ম-প্রচার করি'। এরকম অনেক পাদরিই অকপটে স্বীকার করেন, যে আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা ও জার্মানি থেকে আসা বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রার সাহায্যেই দরিদ্র হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা সহজ হয়। নেপাল থেকে অসহায় অনাথ শিশুদের ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে দত্তক নেবার নাম করে পাচার করা হতো এইসব নির্দয় পাদরিদের মাধ্যমে। এর জন্য ২০১০ সালে, নেপালে সংশোধিত 'দত্তক আইন' প্রয়োগ করে বিপুল আকারে এই 'মানবীয় বেচা-কেনার' বাজার বন্ধ করার প্রয়াস মাত্র করা হয়েছে। আজ থেকে দুই দশক আগেও হিন্দু-বৌদ্ধদের পরম পবিত্র তীর্থভূমি কৈলাস ও মানসসরোবরের রাস্তায় কোনও চমকপ্রদ ও বর্ণাঢ্য চার্চের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সেইসব পথে আজ বিশেষ পরিকল্পনা মাফিক তৈরি করা অসংখ্য চার্চের উপস্থিতি শুধুমাত্র একটি কথায় পরিষ্কার করে দেয়, যে সনাতন ধর্ম মানে শুধু হিন্দুধর্ম আর বাকি ইসলাম ও খ্রিস্টান হলো তথাকথিত আব্রাহামিক ধর্ম যা ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া মাত্র।

(লেখক বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অধ্যাপক)

শোকসংবাদ

গত ১৯ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুনীল কান্তি মৈত্র (জলিদা) পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বৎসর।



তিনি তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু ও নাতিকে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, বহুরমপুর শহরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্গে প্রথম প্রচারক স্বর্গীয় কালীদাস সালোডকর তাঁর বাড়িতে ওঠেন ও সেখান থেকেই প্রথম সঙ্ঘের কাজ শুরু হয়। প্রচারকদের তাঁর বাড়িতে অবাধ যাতায়াত রয়েছে। পূজনীয় গুরুজীও তাঁর বাড়িতে আসেন এবং যে আসনটিতে গুরুজী বসেছিলেন সেটি এখনও সযত্নে সংরক্ষিত। ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘের নিষেধাজ্ঞার সময় তিনি কারাবরণ করেন। কর্মসূত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়ার বিড়লাপুরে দীর্ঘকাল থাকার সময় সেখানে সঙ্ঘ ও অনুসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি খুব ভালো সেতার বাদক ছিলেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে বহরমপুরে ফিরে তিনি প্রায় ৪ বছর স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন। তার একমাত্র পুত্র সোমনাথ (ববি) বহরমপুরের স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদহ জেলার স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল গত ২৭ নভেম্বর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ২ কন্যা ও



নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি কলিগ্রাম সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

* * *

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি খণ্ডের আমগুড়ি শাখার স্বয়ংসেবক তথা ময়নাগুড়ি খণ্ড কার্যবাহ জনার্দন রায়ের পিতা উপেন্দ্রনাথ রায় গত ২৮ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ জেলার গাজোল খণ্ডের মাজারা



মণ্ডল কার্যবাহ পূর্বতন প্রচারক অনুপম গোস্বামীর মাতৃদেবী রুক্মিণী গোস্বামী গত ৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি স্বামী, ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ২৬ নভেম্বর মালদহ জেলা ধর্মজাগরণ প্রমুখ কৃষ্ণ কুমার দাসের পিতা



মদনমোহন দাস পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর-সহ প্রচার প্রমুখ দেবাশিস চৌধুরীর মাতৃদেবী ইলা চৌধুরী গত ২৪ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি স্বামী, ১ পুত্র, ১ কন্যা, নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

শ্রদ্ধানিধি

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা ভারতীর প্রবীণ সদস্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন ভাগ সঙ্ঘচালক সীতেশ ভট্টাচার্য তাঁর মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধানিধি প্রদান করেন সমাজ সেবা ভারতীর কমল চ্যাটার্জির হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৯ ডিসেম্বর নদীয়া জেলার হাঁসখালি খণ্ডের ভায়না শাখার স্বয়ংসেবক মিথুন বিশ্বাস তার পিতৃদেব গোকুল বিশ্বাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন সমাজ সেবা ভারতীর প্রাদেশিক কার্যকরী সভাপতি শিবদাস বিশ্বাসের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

শিখ হত্যার দায়ে কংগ্রেস নেতা সজ্জনকুমারের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ যে অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে আসছেন, সম্প্রতি তার খানিক উপশম ঘটেছে। দিল্লি হাইকোর্ট একটি যুগান্তকারী রায়ে ১৯৮৪ সালে সংঘটিত শিখ নিধনের অন্যতম অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতা সজ্জনকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগে ট্রায়াল কোর্টে সজ্জন কুমারকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৪৩৬, ২৯৫, ১৫৩-এ ও ১৫৩-বি ধারায় সজ্জনকুমারকে শাস্তি দেওয়া হয়। ট্রায়াল কোর্ট প্রমাণাভাবে সজ্জনকুমার অব্যাহতি পেয়েছিলেন। আদালত শুধুমাত্র প্রত্যদর্শী সাক্ষী জগদীশ কৌরের বয়ানের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাননি। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাদের

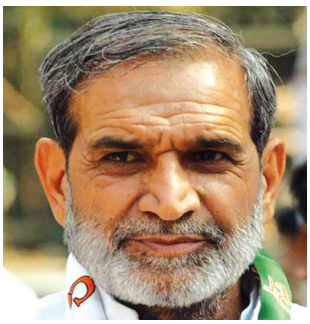

রায়ে বলেন, ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে দেশভাগের বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এর ৩৭ বছর ১৯৮৪ সালে দিল্লি একই ধরনের অন্য একটি ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দিল্লিতে শিখ নিধনে যারা অভিযুক্ত তারা এতদিন যথেচ্ছ রাজনৈতিক প্রশ্রয় পেয়েছে। ফলত তাদের বিচার প্রক্রিয়া শুরুই করা যায়নি।' ট্রায়াল কোর্ট সজ্জনকুমারকে অব্যাহতি দিলেও অন্য পাঁচ অভিযুক্তের মধ্যে খোক্কর, ভাগমল ও লালকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মহেন্দর যাদব এবং কিষাণ খোকরকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর বলওয়ান খোকর, প্রাক্তন নৌ-অফিসার ক্যাপ্টেন ভাগমল এবং গিরিধারীলাল দুই সহকারীকে নিয়ে ১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর দিল্লির রাজনগর এলাকার বাসিন্দজা একটি শিখ পরিবারের ওপর চড়াও হয়ে পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে হত্যা করে। এটা ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হন এবং তার প্রতিবাদে প্রায় ৩০০০ শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষকে হত্যা করে কংগ্রেস কর্মীরা।

শিখনিধনের পাণ্ডা কমলনাথের অপসারণের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এক ঐতিহাসিক রায়ে দিল্লি হাইকোর্ট ১৯৮৪ সালে শিখনিধনের অন্যতম অভিযুক্ত সজ্জনকুমারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। আদালতের রায় ঘোষণার পরেই জাতীয় রাজনীতির অভিমুখ ঘুরে গেছে এমন কয়েকজন কংগ্রেস নেতার দিকে, যাদের অঙ্গুলিহেলনে শিখনিধন সংঘটিত হয়েছিল বলে অভিযোগ। এরকমই একজন নেতা কমলনাথ। তিনি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার অপসারণের দাবি উঠে গেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরৎ কৌর বাদল বলেন, 'রাজীব গান্ধীর ডান হাত বলে পরিচিত নেতাদের কংগ্রেস এখনও প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এরকমই একজন নেতা কমলনাথ। কমলনাথই শিখদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ তিনি মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।' পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং শিরোমণি অকালি দলের নেতা প্রকাশ সিংহ বাদল বলেন, 'কমলনাথ কো চিফ মিনিস্টার বানানা আচ্ছি বাত নেহী হ্যায়।' অর্থাৎ কমলনাথকে মুখ্যমন্ত্রী করা ঠিক



নয়। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পঞ্জাবে কমলনাথের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে। সারা দেশের শিখ জনসমাজ ক্ষুব্ধ, অপমানিত। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, '১৯৮৪ সালের শিখ নিধনে যারা জড়িত ছিল তাদের অনেককেই কংগ্রেস টিকিট দিয়েছে। ভোটে জিতে তারা কেউ সাংসদ হয়েছেন, কেউ কেউ মন্ত্রীও হয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথও শিখনিধনে একজন অভিযুক্ত। ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে শপথগ্রহণের দিনই আদালতে তাদের মুখোশ খসে পড়ল। এই প্রসঙ্গে রিপাবলিক টিভির অর্ণব গোস্বামীর সঙ্গে কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি রাহুল গান্ধীর একটি সাক্ষাৎকারের কথা বলা যেতে পারে। অর্ণবের প্রশ্ন : আপনি কি ১৯৮৪ সালের শিখনিধনের জন্য ক্ষমা চাইবেন? এই হত্যাকাণ্ডে কংগ্রেসকর্মীরা কি জড়িত ছিলেন? রাহুলের উত্তর : সম্ভবত কেউ কেউ জড়িত ছিল। অর্ণবের প্রশ্ন : আপনি বলতে চাইছেন, কংগ্রেসকর্মীরা জড়িত ছিলেন? রাহুলের উত্তর : হ্যাঁ কিন্তু তাদের অনেকে শাস্তিও তো পেয়েছে। যদিও পরে বিদেশে গিয়ে রাহুল একথা অস্বীকার করে বলেন, 'কংগ্রেস শিখ হত্যায় জড়িত ছিল, আমি বিশ্বাস করি না।' রাহুলের প্রথম বিবৃতিটিই সত্যি। কারণ তিন হাজার শিখের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে রাজীব গান্ধীও বলেছিলেন, 'একটা বড়ো গাছ যখন মুখ থুবড়ে পড়ে তখন তার চারপাশের মাটি এভাবেই কেঁপে ওঠে। অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের এহেন প্রতিশোধকে তিনি সমর্থনই করেছিলেন।

মুসলমানদের দাবি ইমাম-ই-হিন্দ শ্রীরামের মন্দির হোক অযোধ্যায়



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে এমন ঐতিহাসিক মুহূর্ত খুব কমই এসেছে। সম্প্রতি দিল্লির যন্তরমন্তরে সারা দেশ থেকে আসা অগণিত মুসলমান অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের দাবি তুললেন। যন্তরমন্তরের জনসভাটির আয়োজক ছিল রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ। রাষ্ট্রীয় এই সংগঠন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সংযোজক ইন্দ্রেশকুমারের নেতৃত্বে ২০০২ সাল থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সাংস্কৃতিক শুদ্ধিকরণের কাজ করে চলেছে। জনসভায় নারীপুরুষ শিশু ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে মুসলমান জনতার স্লোগান ছিল : 'হিন্দুস্থান কে মুসলমান নে আব থানা হ্যায়, ইমাম-ই-হিন্দু শ্রীরাম কা মন্দির উত্তহি বানানা হ্যায়; ঝগড়া সদা সদা কে লিয়ে খতম করনা হ্যায়, তারাক্কি তালিম ভাইচারেওয়ালা হিন্দুস্থান বানানা হ্যায়।' দেশের প্রতিটি রজ্যের ২৫০টি জেলা থেকে হাজার হাজার মুসলমান দিল্লির শীত উপেক্ষা করে যন্তর মন্তরে মিলিত হন। এই ধরনের সভা এবারই প্রথম সংগঠিত হলো। এই প্রথম দেশের মুসলমান সমাজের একটি বড়ো অংশ অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের দাবিকে প্রকাশ্য সভায় সমর্থন জানাল। ইন্দ্রেশকুমার ছাড়া প্রথম সারির ইসলামিক তাত্ত্বিক এবং গবেষকেরা যেমন— মৌলানা কওকব মুজতবা, মৌলানা সুহেব কাশমি, প্রেস কাউন্সিলেন সদস্য রাজারিজভি, ড. শহিদ আখতার, ড. মজিদ আহমেদ তালিকাটি, মহম্মদ আফজল, আবু বকর নকভি, শাহনওয়াজ আফজল শাহিন পরভেজ প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন, রামমন্দির ধ্বংস করে বাবর সেখানে মসজিদ বানিয়েছিল। ইসলাম অনুযায়ী এটি 'মসজিদ' পদবাদ্য হতেই পারে না। এখানে নমাজ পড়লেও সেই নমাজ আল্লাহ্ স্বীকার করেন না। বক্তারা রামমন্দির নিয়ে নোংরা রাজনীতি না করার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের সংযোজক ইন্দ্রেশকুমার বলেন, এটা ভাবা অন্যায় হবে যে দেশের প্রত্যেক মুসলমানের অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের বিরোধী। বস্তুত সাধারণ মুসলমানেরা চান মন্দির হোক। তাঁরা শ্রীরামকে ইমাম-ই-হিন্দ বলে মানেন। কবি আল্লামা ইকবাল পাকিস্তানে চলে যাওয়ার আগে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা...' রচনা করেন। তিনিই প্রথম শ্রীরামকে ইমাম-ই-হিন্দ বলে বর্ণনা কনে।

সভার বক্তব্য সংবলিত স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে। রামমন্দির নির্মাণের বিষয়টি অযথা ঝুলিয়ে না রেখে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মহলকে।

সীমান্ত গান্ধীর পৌত্রের বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪। পাকিস্তানের আর্মি পাবলিক স্কুলে সন্ত্রাসবাদীদের তাণ্ডবলীলার চতুর্থ বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে সীমান্ত গান্ধীর পৌত্র তথা আওয়ামি ন্যাশনাল পার্টির প্রেসিডেন্ট আসফানদ্যর ওয়ালি খান রীতিমতো বোমা ফাটালেন। তিনি জানিয়েছেন সেদিনের সন্ত্রাসবাদীরা শুধুমাত্র বহাল তবিয়তে এখন শুধু ঘুরছেই না, সরকারি আতিথ্যও উপভোগ করছে। প্রসঙ্গত পাক আর্মি পাবলিক স্কুলে তেহরিক-ই-তালিবানের বোমা-গুলি-সহ আত্মঘাতী হামলার ঘটনায় ১৫০ জনের মৃত্যু ঘটে, যার মধ্যে ১৩৭ জনই ছিল শিশু। সরকারি এই হিসেবের চেয়ে প্রকৃত সংখ্যাটা অনেক বেশি বলেই মনে করেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। এই তালিবানি হত্যাকাণ্ডে শিউরে ওঠে গোটা বিশ্ব। পাকিস্তানের যাবতীয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি তখন তেহরিক-ই-তালিবানের ছত্রছায়ায় এসেছিল।

পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এক বার্তায় বলেছেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাক আর্মি স্কুলে হানাদারির ঘটনা পাকিস্তানবাসীকে একত্রিত করেছে। এবং এই আঘাত মানবতায় চরম ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। যদিও এসবই যে কথার কথা তা আসফানদ্যরের অভিযোগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তেহরিক-ই-তালিবানের প্রাক্তন মুখপত্র এসানুল্লাহ এহসানের বক্তব্য তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন ২০১৭-র এপ্রিলে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে এহসান আত্মসমর্পণ করে এবং বর্তমানে ল' এনফোর্সমেন্টের অধীনে তাকে রীতিমতো আইনি ও শারীরিক নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।

আসফানদ্যরের এ-ও বক্তব্য যে যতদিন পর্যন্ত দেশের জঙ্গি অভয়ারণ্যগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দেশে শান্তি কিংবা প্রগতির কোনও আশা নেই। আর্মি পাবলিক স্কুলের অপরাধীরা শাস্তি পাক, স্বজনহারারা এই দাবি জানালেও পাক সরকারের কোনও হেলদোল নেই বলে তাঁর অভিযোগ।

প্রয়াগরাজে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৬ ডিসেম্বর প্রয়াগরাজে এক অনুষ্ঠানে বিমানবন্দর টার্মিনাল সহ কুম্ভ মেলার জন্য সুসংহত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা কেন্দ্রের (কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার) উদ্বোধন করেন।



প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ কুম্ভ প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পাশাপাশি গঙ্গা পুজো দেন। তিনি প্রয়াগরাজে 'অক্ষয়বট' পরিদর্শন করেন। প্রয়াগরাজের আন্দাওয়াতে তিনি একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ, উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন।

এক জনসভায় ভাষণে তিনি জানান, অর্ধকুম্ভ মেলার তীর্থযাত্রীরা এবার থেকে 'অক্ষয়বট' ঘুরে দেখারও সুযোগ পাবেন। প্রয়াগরাজে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস নিচ্ছে জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, আজ যে প্রকল্পগুলি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে, সেগুলি পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করবে। রেকর্ড এক বছরের মধ্যে নতুন বিমানবন্দর টার্মিনালটি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানান।

অর্ধকুম্ভ মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের অভিনব অভিজ্ঞতা প্রদান করতে যাবতীয় প্রয়াস গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রয়াস গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো ভারতের গৌরবময় অতীত এবং প্রগতিশীল ভবিষ্যৎকে সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরা।

গঙ্গা নদীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলতে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নদী তীরবর্তী ঘাটগুলির সৌন্দর্যায়নে এবং বর্জ্য পরিচালনা কেন্দ্র স্থাপনে এই প্রয়াস সুদূরপ্রসারী হবে।

কুম্ভ মেলাকে ভারত এবং ভারতীয়ত্বের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে শ্রী মোদী বলেন, এই মেলা সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এবং 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ঝলক তুলে ধরে। তিনি আরও বলেন, কুম্ভ মেলার আয়োজনে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বিষয় নয়, বরং মর্যাদার প্রতীকস্বরূপ। মেলায় আগত প্রত্যেককে যথাযথ আপ্যায়ন করা হবে। অর্ধকুম্ভ মেলা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে কীভাবে 'নতুন ভারত' গড়ে তুলছে তা তুলে ধরবে।

রায়বেরিলিতেও একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একদিনের উত্তরপ্রদেশ সফরে গিয়ে গত ১৬ ডিসেম্বর রায়বেরিলিতে আধুনিক রেল কামরা নির্মাণ কারখানা পরিদর্শন করেন। এক জনসভায় তিনি ৯০০তম রেল কামরা এবং হামসফর ট্রেনের উদ্বোধন করেন। রায়বেরিলিতে তিনি একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ, উদ্বোধন তথা শিলান্যাস করেন।

এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ যে প্রকল্পগুলি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ, উদ্বোধন বা শিলান্যাস করা হয়েছে, সেগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রায়বেরিলির আধুনিক রেল কামরা নির্মাণ কারখানাটি যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং এই কারখানাটি রায়বেরিলিকে রেল কামরা নির্মাণের দিক থেকে এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত করবে।

১৯৭১-এ আজকের দিনটির কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই সমস্ত শক্তিগুলিকে পরাজিত করেছিল যারা সন্ত্রাস, বর্বরতা এবং বেপরোয়া মনোভাবের প্রতীক। তিনি বলেন, বর্তমানে সরকার সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। তবে, এমন কিছু শক্তি রয়েছে যারা চায় না সশস্ত্র বাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠুক। তিনি আরও বলেন, যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকেন তারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, বিমানবাহিনী এমনকী, বিদেশি সরকারের নামেও কুৎসা ও কলঙ্ক প্রচার করছেন। মিথ্যার প্রতি যাদের আসক্তি রয়েছে তাদের কেবল বিশ্বাস দিয়ে পরাজিত করা সম্ভব। দেশের নিরাপত্তা এবং সশস্ত্র বাহিনীগুলির প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনায় রাখে। কৃষকদের আয় বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ২২টি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়েছে বলেও তিনি জানান। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে কৃষক সমাজকে অতিরিক্ত ৬০ কোটি টাকা প্রদান করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় অপ্রত্যাশিতভাবে যে সমস্ত কৃষকের শস্যের ক্ষতি হয়েছে, তাঁরা উপকৃত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার 'সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকলের বিকাশ'--- এই মন্ত্রে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

আহার বা খাদ্য পানীয় গ্রহণের কিছু নীতি-নিয়ম

অতিসবরণ আইচ

● 'অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি...' জীবের সৃষ্টি অন্ন থেকে। অর্থাৎ অন্নের পরিপাক থেকে সপ্ত রসের সৃষ্টি। সপ্ত রসের অন্তিম রস শুক্রাণু বা ডিম্বাণু।

● আমরা সকলেই ডিম্বাণু-শুক্রাণু মিলনের পরিণতি।

● খাদ্যের কারণে শুধু আমাদের সৃষ্টি নয়, আমাদের স্থিতি অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা শরীর বিকাশের মূলেও খাদ্য। আবার এই খাদ্যের কারণেই স্বাস্থ্যহানি মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

● আয়ুর্বেদ বলে শুধুমাত্র খাদ্যাখাদ্য বিচারের দ্বারাই একজন সুস্থ দেহে শতায়ু হতে পারে।

● ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণের সব বস্তুই যে স্বাস্থ্যকর কল্যাণকর নয়, সেটা আমরা অনেকেই বুঝি না। আর বুঝি না বলেই নানা বিপত্তি গ্রাস করে আমাদের।

● আন্তরিক ভালোবাসা স্নেহ শ্রদ্ধাপূর্বক অনেক কিছু খাওয়ানো হয় যা কিনা স্বাস্থ্যহানিকর ও আয়ুনাশক।

● অজ্ঞানতাই শুধু কারণ নয়; একদিন না-হয় একটু খারাপ জিনিস খেলো তাতে কী এমন ক্ষতি হবে। এই মানসিকতা বেশি কাজ করে।

● আহার্য দ্রব্যের গুণ ও সময়ের মাহাত্ম্য আমরা বুঝি না বা জানি না বলেই অবলীলায় অনাচার করি।

● অন্ন মানে শুধু ভাত নয়; চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়— সবকিছুই অন্ন।

● বয়স-স্বাস্থ্য-সময়-ঋতু বিচারপূর্বক খাদ্য গ্রহণ বা বর্জনের ব্যবস্থা আছে।

● একজনের কাছে যা অত্যন্ত উপযোগী অন্যের কাছে তা বিষবৎ হতে পারে। যেমন ঘি শিশুর কাছে বিষ, বৃদ্ধের কাছে অমৃত।

● দিনে যে খাদ্য উপকারী, সে খাদ্যই রাতে অপকারী হতে পারে। যেমন দই, শশা, কলা, পেয়ারা, বেল, বাতাপি রাতে অপকারী।

● আমরা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য শুধু খাই না, স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টির জন্যও খাই।

● অনেক খাদ্য আছে কাঁচা উপকারী, রান্না করে খেলে উপকারী নয়। যেমন, আপেল-ন্যাসপাতি।

● সূর্যোদয়ের আগে কোনো খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

● সূর্যোদয়ের এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টা পর পাকস্থলী পূর্ণশক্তি লাভ করে খাদ্য হজম করায়।

● সুতরাং ৮-৩০/৯টার আগে তৈলাক্ত মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য না খাওয়া উচিত।

● সকালের খাবার যতটা, তার অর্ধেক দুপুরে এবং দুপুরের অর্ধেক রাত্রে খাওয়াই হলো প্রকৃত স্বাস্থ্যকর।

● সকালের খাবার থেকেই শরীর সবচেয়ে বেশি পুষ্টি ও শক্তি সংগ্রহ করে।

● সকালের খাদ্যে যেন ভিটামিনস্ প্রোটিন, ফ্যাট, ক্যালোরি যথেষ্ট মাত্রায় থাকে।

● সকলের খাবারের আগে কিছু জলীয় খাদ্য খেতে পারি। যেমন লেবু রস, মেথি ভেজানো জল, মেথি/করলা সেদ্ধ জল, কলা/মিষ্টি বা টক ফলের রস, নিম পাতা সেদ্ধ জল, চিরতা ভেজানো জল, ছোলা বাদাম ভেজানো জল ত্রিফলা ভেজানো জল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একেক দিন একটা জিনিস খেতে পারি।

● সকালের জলখাবারে মাঝে মাঝে পাঁচমিশেলি সবজি থাকবে। তা রুটি বা খিচুড়ি বা মুড়ি দিয়ে খাওয়া যেতে পারে বা শুধু সবজি বেশি পরিমাণে।

● সবুজ মুগডাল তিন ভাগের দু'ভাগ ও একভাগ ডালিয়া দিয়ে সবুজ সবজি সহযোগে খিচুড়ি সকালের জলখাবারে খুব স্বাস্থ্যকর। সঙ্গে একটু মাখন দিতে হবে যদি পেটে সয়।

● সকালের জলখাবারের চিড়ে-খই-মুড়ি-দই-নারকোল কোরা ভেলি বা আখের গুড়-সহ কোনও কেনও দিন খাওয়া যেতে পারে। একটু কর্পূর গন্ধলেবুর রস থাকলে খুবই ভালো লাগবে।

● কোনও কোনও দিন শুধু ফল ও দুধ দিয়ে সকালের জলখাবার খাওয়া যেতে পারে।

● গরমকালে পান্তাভাত নুন লেবু পিঁয়াজ কাঁচালঙ্কা সহযোগে যেমন খাওয়া যায়, তেমনি টক দই, পাকা কলা-সহ পান্তাও সুখাদ্য। পাটপাতা বা ডালের বড়া-সহ সামান্য কাঁচা সরষের তেল-সহ পান্তাও খেতে ভালো।

● পাঁচমিশেলি ডাল ওল গাজর সোয়াবিনের বড়ি-সহ কারিপাতা ও মাখন দিয়ে সকালের জলখাবার কোনও কোনও দিন হতে পারে।

● সবজি দিয়ে সুজির পোলাও বা চিড়ের পোলাও কোনও কোনও দিন খাওয়া যেতে পারে।

● লুচি পরোটা চাউমিন ন'মাসে-ছ'মাসে শখ করে এক-আধ দিন খাওয়া যেতে পারে। নিত্য বা মাঝে মাঝে নয়। কুখাদ্য এসব।

● পাউরুটি-কেক-প্যাটিস-মোগলাই ওইরকম বছরে এক-আধ দিন চলতে পারে।

● দুপুরের খাওয়ার প্রকৃষ্ট সময় ১১টা থেকে ১টার মধ্যে।

● ভাত বা রুটি যাই খাওয়া হোক না কেন সেটা যেন ৩ ভাগের ১ ভাগ হয়। বাকি ২ ভাগ ডাল-সবজি বা মাছ।

● পাগস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ যেন ফাঁকা থাকে।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

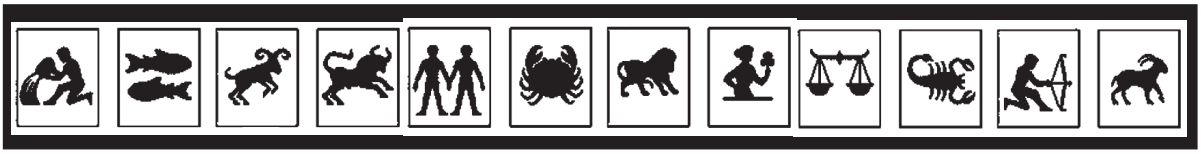

২৪ ডিসেম্বর (সোমবার) থেকে ৩০ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, তুলায় শুক্র, বৃশ্চিকে বুধ-বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মকরে কেতু, মীনে মঙ্গল। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মিথুনে পুনর্বসু নক্ষত্র থেকে কন্যায়।

মেষ : শিল্প নিপুণতা বৃদ্ধি, সুন্দরের পূজারি। স্নেহপ্রবণ মন, বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষায় নতুন সুযোগ। বিলাস ব্যসন সুখ ও গৃহ সরঞ্জামে ব্যয় যোগ। প্রকাশক, সাহিত্যিক, সাংবাদিকের সাফল্য। তবে মাতার স্বাস্থ্যাবনতি ও বাহন চালকদের সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

বৃষ : অলংকার বা উপহার প্রাপ্তি। উদার-নীতিপরায়ণ, মিষ্টি স্বভাবের প্রকাশ, শৌখিন। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে ইতিবাচক ফল। বিদ্যার্থী ও কর্মপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিশিষ্টজনের সান্নিধ্যে উপকৃত। তীর্থ দর্শনে হঠাৎ ভ্রমণ ও একাধিক পন্থায় উপার্জনের নতুন দিশা।

মিথুন : উচ্চ শিক্ষার্থীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দক্ষতার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ। স্ত্রী/স্বামীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও পারিবারিক সম্মান ও আভিজাত্যে নয়া সংযোজন। প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি। নবজাতক লাভে আনন্দ। ভ্রাতা-ভগ্নি ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্র শুভ, তবে দোদুল্যমানতা পরিহার করবেন।

কর্কট : সুস্থ শরীরে আত্মপ্রত্যয়ী হলে সৃজনশীল কর্মে সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ। পেশাদারদের ব্যস্ততা বৃদ্ধি তবে প্ররোচনা এড়িয়ে চলুন। স্বজন বিরোধিতা ও লাস্যময়ীর কুহকে গোপন বহ্নিতে ঘৃতাহুতি, পরিবহণ ব্যবসায়ী ও রিপ্রেজেন্টেটিভদের অতিরিক্ত রোজগারের সম্ভাবনা। হঠাৎ আঘাতে ক্লেশ ভোগ।

সিংহ : স্বজন সম্পর্ক ও পারিবারিক স্বস্তি। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা, শিল্পনিপুণতা ও সাহিত্য পিপাসুদের সৃষ্টির বৈচিত্র্য, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব। সপ্তাহের শেষভাগে সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও শরীরের উর্ধ্বাঙ্গে চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

কন্যা : স্বামী/স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তায় কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাপূরণ ও বৈষয়িক সতর্ক থাকা দরকার। সন্তানের আবেগপ্রবণ মানসিকতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া ও সময়ের অপচয়। গুরুজনের পরামর্শ বৈষয়িক সমস্যা সমাধানের সহায়ক। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার পূর্ণ মূল্যায়ন নাও পেতে পারেন।

তুলা : মননশীল, সহনশীলতা ও মিষ্ট স্বভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ, তবে প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিতে হতাশার সমুদ্রে অবগাহন। স্বজন বান্ধব ও বিদ্যার্থীর সাধনায় দীপ্তি। বেকারত্বের অবসানে জীবনে নব সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা। পেশাদারদের কর্মক্ষেত্রে চাপ ও স্থানান্তরের সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক : ভ্রাতা-ভগ্নীর জ্ঞানভাণ্ডার ও বৈষয়িক উন্নতি ও পুত্রলাভ। পিতার শরীরের যত্নের প্রয়োজন। ব্যবসা, বাড়ি, গাড়ি, অলংকার প্রাপ্তির শুভ সময়। মাতৃসম্পর্কে সম্পদলাভ ও প্রতিবেশীর সাহচর্যে তৃপ্তি। সহানুভূতি, সমবেদনা ও সমাজ সেবায় আভিজাত্য গৌরব।

ধনু : প্রতিকূল পরিবেশের অবসান। পরদুঃখ কাতর, আর্থিক অপ্রাচুর্য, গৃহসুখ, বিস্মিত তবে সারল্য, নম্রতা, নীতিনিষ্ঠ, বন্ধুপ্রিয়, অনুভবী, মেধাবী ছাত্র, আদর্শ পিতা, সুদক্ষ নায়ক এবং কীর্তিমান ও সৌভাগ্যশালী।

মকর : চালাকি ও কৌশলীমন। আঁধারে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। স্বামী/স্ত্রীর চিকিৎসা ও আইনি জটিলতায় ব্যয়াধিক যোগ। বিজ্ঞানী, গবেষক, সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, গণিতজ্ঞ ও আইটি সেক্টরে নিযুক্তদের কর্ম দক্ষতার বহুমুখী প্রকল্প, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে নিজ যোগ্যতায় মর্যাদা ও সম্মান জনপ্রিয়তা প্রাপ্তি। বিদ্বান, পুত্রবান, প্রতিপত্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সন্তানের লেখাপড়ায় সাফল্যে পারিবারিক আনন্দ। গৃহে বিবাহ অথবা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। শিল্পী, কলাকুশলীদের উদ্ভাবনা সৃষ্টিতে আনন্দ ও আর্থিক উচ্চগতি। অংশীদারী ব্যবসায় বিনিয়োগে নেতিবাচক ফল।

মীন : বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, কৃষি, পশুহানি। মাতার শারীরিক ক্লেশ, বিদ্যা ও শান্তি বিঘ্নিত। সপ্তাহের প্রান্তভাবে ঝুলে থাকা সমস্যা ও কাজের সুষ্ঠ সমাধানে উদ্বেগমুক্ত ও পারিবারিক অনুকূল পরিবেশ। ভ্রাতা-ভগিনীর বৈবাহিক দিনমান নির্ধারণ ও সন্তানের আচরণে আধুনিকতার পরশ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য